কিশোর কাহিনি সিরিজ

ছকটা সুডোকুর

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

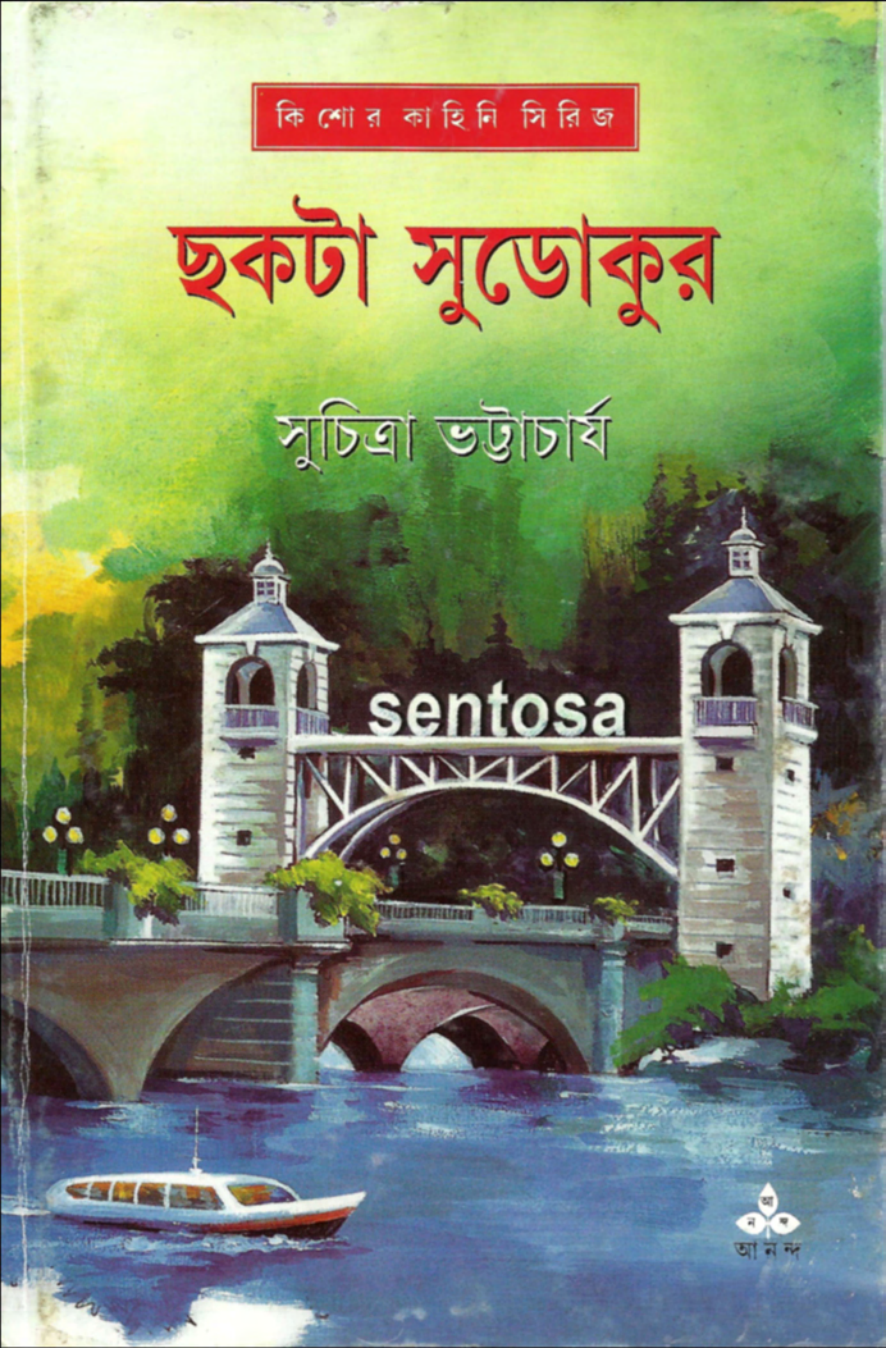

আনন্দ

ছকটা সুডোকুর

ছকটা সুডোকুর

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

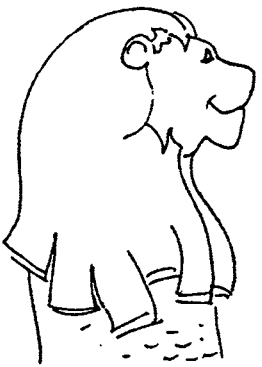

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : অমিতাভ চন্দ্র

আ ন ন্দ

সিঙ্গাপুরের ছোট্ট সঙ্গী
অর্পণ বসুকে

অনেক দিন পর আজ একটা সিনেমা দেখতে গিয়েছিল টুপুর। মিতিনমাসি আর বুমবুমের সঙ্গে। ক্যারিবিয়ান সমুদ্রের জলদস্যুদের নিয়ে গল্প। ছবির শুরু থেকে শেষ অবিরাম ঢিসুম ঢাসুম, তলোয়ারের ঝনঝনানি, আর মাস্তুলতোলা জাহাজে বিকট চেহারার দাড়িওয়ালা মানুষজনের বিস্তর লাফঝাঁপ। উপরি পাওনা, সুন্দর-সুন্দর সিনারি। সমুদ্রে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, নীল সাগরের বুকে সবুজ-সবুজ পাহাড়ি দ্বীপ...আহা, চোখ যেন জুড়িয়ে যায়। টানা আড়াই ঘণ্টা জমজমাট সব দৃশ্য দেখে টুপুর যখন সিট ছেড়ে উঠল, গত এক মাসে পরীক্ষার চাপে জেরবার হয়ে যাওয়া মাথা দিব্যি ফুরফুরে হয়ে গিয়েছে।

হল থেকে বেরোতে না-বেরোতেই মিতিনমাসির মোবাইল ফোনে সুরেলা ঝংকার। নম্বরটা দেখে নিয়ে, দু'-চারটে 'হুঁ-হ্যাঁ আচ্ছা' বলে ফের ভ্যানিটিব্যাগে চালান করে দিল ফোন।

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "কে গো? তোমার কোনও ক্লায়েন্ট?"

"উঁহু, তোর মেসো। আজ শনিবার তো, তাড়াতাড়ি ফিরেছে প্রেস থেকে। আর ফিরেই হাঁকাহাঁকি শুরু করেছে।"

"কেন?"

"কী যেন এক জব্বর খবর আছে।"

"কী খবর?"

"ভাঙল না তো। বলল, সাসপেন্স। বাড়ি গেলে তবে জানাবে।"

"তা হলে ফোনটা করল কেন?"

"ওটাই তো তোর মেসোর ট্যাকটিক্স। ভেবেছে কৌতূহলে পেট ফুলবে, দৌড়তে-দৌড়তে আমরা বাড়ি চলে যাব।... যাক গে যাক, খাবি কিছু?"

বুমবুম বেশ একটা বড়-বড় হাবভাব নিয়ে পাশে-পাশে হাঁটছিল। খাওয়ার কথা কানে যেতেই লাফিয়ে উঠেছে, "চিপ্‌স খাব, চিপ্‌স।"

মিতিন মাথা নেড়ে বলল, "এখন নো চিপ্‌স।"

"তা হলে আইসক্রিম?"

"চলতে পারে। তবে পেটে সলিড কিছু পড়ার পর... গরম গরম মোমো খেলে কেমন হয়?"

আহারের ব্যাপারে বুমবুমের অজস্র ফ্যাঁকড়া। তবে মোমোর প্রস্তাবটা তার মনে ধরেছে। টুপুরেরও। এলগিন রোডের ফুটপাত ধরে এগোচ্ছিল তিনজনে, পথ বদলে চলে এসেছে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হসপিটালের সামনে। ছোট্ট তিব্বতি রেস্তরাঁয় ঢুকে অর্ডার দেওয়া হল স্টিম্‌ড মোমোর। সঙ্গে টুপুরের জন্য তার প্রিয় থুপকাও।

খেতে-খেতে সিনেমাটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। বুমবুম বলল, "মা, জলদস্যুরা বড় বেশি নিষ্ঠুর হয়, তাই না?"

"হুম। খুব মারপিট করে। লুটপাটের সময় ওরা কোনও বাধা মানে না, ঘ্যাচাং-ঘ্যাচাং মাথা কাটে।"

"আমাদের দেশে জলদস্যু নেই?"

"আগে অনেক ছিল। এখনও আছে কিছু। তারা মাঝে-মাঝে সুন্দরবনের নদীগুলোতে লঞ্চ বা নৌকোর যাত্রীদের উপর হামলা চালায়।"

"অবশ্য আমরা ওদের জলদস্যু বলি না," টুপুর এবার নিজের জ্ঞান জাহির করল, "আমরা ওদের নাম দিয়েছি হার্মাদ।"

"দুর বোকা, এখনকার ওই ডাকাত-লুঠেরাগুলো হার্মাদ হতে যাবে কেন? হার্মাদ তো পর্তুগিজ জলদস্যু। স্পেন-পর্তুগালের

নৌবহরের নাম একসময় ছিল 'আর্মাডা'। পর্তুগিজ জলদস্যুরা বিরাট-বিরাট জাহাজ নিয়ে আসত বলে কীভাবে যেন ওই আর্মাডা শব্দটা লোকের মুখে-মুখে হার্মাদ হয়ে গিয়েছিল।"

"বুঝেছি, যেমন মরাঠা দস্যুদের বলা হত বর্গি।"

"রাইট। বর্গ মানে শ্রেণি বা দল। মরাঠিরা দল বেঁধে আক্রমণ করত তো, তাই বর্গ থেকে বর্গি। কিংবা ধর, মগ। ব্রহ্মদেশ, অর্থাৎ বর্মা... এখন কিনা যার নাম মায়ানমার... সেখানকার লোকরা নামের আগে লিখত মং, আমাদের যেমন শ্রী বা শ্রীমান। ওই মং থেকেই বর্মার লোকের নাম হয়েছিল মগ।"

"তাই নাকি?" টুপুরের চোখ বড়-বড়, "আমরা যে তা হলে কথায়-কথায় 'মগের মুলুক' বলি, সেটা আসলে বর্মাদেশ?"

"ইয়েস ম্যাডাম। এককালে ওখানে ভীষণ অরাজক অবস্থা ছিল। কেউ আইন-কানুনের তোয়াক্কা করত না। খুন-জখম, চুরি, রাহাজানি, ছিনতাই লেগেই থাকত। তাই যে দেশে কেউ কোনও নিয়মকানুন মানে না, সেটাকে আমরা বলি মগের মুলুক।"

এত সব জ্ঞানগর্ভ বিষয় বুমবুমের বুঝি একটুও পছন্দ হচ্ছিল না। মাত্র দু'খানা চিকেন মোমোতে তার পেট ভরে গিয়েছে, এখন সে আইসক্রিম চায়। অগত্যা চটপট প্লেট শেষ করে টুপুরদের উঠতেই হল। বাইরে এসে ছেলেকে একটা স্ট্রবেরি কাপ কিনে দিয়ে মিতিন ট্যাক্সি ধরেছে। জানলার ধারে বসে আইসক্রিম চাটতে-চাটতে চলেছে বুমবুম, মাসি আর বোনঝি কথা বলছে টুকটাক। ট্যাক্সি যখন বাড়ির সামনে পৌঁছল, তখনও বুমবুমের কাপ চাটা শেষ হয়নি।

তিনতলায় উঠে ফ্ল্যাটের ডোরবেল বাজাতে হল না, তার আগেই পার্থ দরজা খুলেছে। সম্ভবত ব্যালকনিতে ছিল, দেখতে পেয়েছে ট্যাক্সি। উত্তেজিত মুখে বলল, "তোমরা এত দেরি করলে?"

মিতিন সেভাবে আমল দিল না। ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বলল,

"তো? হয়েছেটা কী?"

"খবরটা দেব বলে কখন থেকে অপেক্ষা করে আছি... এমন একটা গ্র্যান্ড নিউজ়..."

"হুঁ। বুঝলাম। তা প্রাইজ়টা কী?"

পার্থ থতমত খেল একটু। ঢোক গিলে বলল, "কী করে বুঝলে প্রাইজ় পেয়েছি?"

"সিম্পল। তোমার উচ্ছ্বাস দেখে," মিতিন চটি ছেড়ে সোফায় গিয়ে বসল। ভুরু বাঁকিয়ে বলল, "এটুকু আন্দাজ করতে পারি বলেই তো আমি ডিটেকটিভ হয়েছি, নয় কি?"

"তা বটে!" পার্থ হেসে ফেলল, "এবার তা হলে প্রাইজ়টাও গেস করে ফ্যালো।"

"হবে হাঁড়ি-কড়া গোছের কিছু। কিংবা স্যান্ডউইচ-টোস্টার। অথবা ইলেকট্রিক ইস্ত্রি।"

"ঢিলটা মোটেই লাগল না ম্যাডাম!" পার্থর হাসি চওড়া হল, "সুডোকু মেলানো নিয়ে খুব আওয়াজ দিতে না আমায়? ওই সুডোকুর কল্যাণেই একটা ফ্যান্টাস্টিক অফার পেয়েছি।"

"কীরকম?"

"ফুল ফ্যামিলি বিদেশ ভ্রমণ। প্রায় নিখরচায়।"

এবার মিতিনও চমকেছে। টুপুরের তো চক্ষুস্থির হওয়ার দশা। এমনও হয় নাকি?

আস্তে-আস্তে ব্যাপারটা খোলসা হল। ইদানীং শব্দছকের পাশাপাশি নতুন একটা নেশায় মেতেছে পার্থ। সুডোকু। খবরের কাগজ হোক, ম্যাগাজিনই হোক, যেখানেই ওই ন' ঘরের সংখ্যাছক চোখে পড়ে, অমনই বসে যায় মেলাতে। খুচরো প্রাইজ়ের আশায় পোস্ট করে দেয় নির্দিষ্ট ঠিকানায়। অবশ্য একটা আলপিনও জোটেনি কখনও। কিন্তু এবার সত্যি-সত্যি কপালে শিকে ছিঁড়েছে।

গত তিন মাস ধরে, ফি রোববার, ইংরিজি খবরের কাগজের সঙ্গে একটা হ্যান্ডবিল আসছিল বাড়িতে। সুডোকুর ছকসহ। দিল্লির কোন এক পেঙ্গুইন রিসর্ট্‌স ইন্টারন্যাশনালের পাঠানো। হ্যান্ডবিলে ঘোষণা থাকত, ঠিকঠাক ছক মিলিয়ে অমুক পোস্টবক্সে পাঠিয়ে দিন। প্রথম সঠিক উত্তরদাতার জন্য রয়েছে এক আকর্ষক পুরস্কার। তা পার্থ প্রতিবারই তড়িঘড়ি পাঠিয়ে দেয়, তবে কিছুতেই ফার্স্ট হতে পারে না। অবশেষে নবম চেষ্টায় সফল হয়েছে সে। এবং পুরস্কারটাও সত্যিই লোভনীয়। স্বামী-স্ত্রী আর একটি বাচ্চার সিঙ্গাপুর যাতায়াতের প্লেনভাড়া দিচ্ছে পেঙ্গুইন ইন্টারন্যাশনাল। সঙ্গে সিঙ্গাপুরের কোনও একটি বিশেষ হোটেলে তিন দিন, দু' রাত থাকার খরচাও।

বলতে-বলতে পার্থ উল্লাসে ফুটছিল। প্রায় হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "ব্যাপারটা বুঝলে তো? যাতায়াত ফ্রি, থাকা ফ্রি। শুধু খাওয়াদাওয়ার খরচটা যা লাগবে। আর এদিক-ওদিক বেড়ানো, কি কিছু কেনাকাটার। একটা বিদেশি শহরে ঢুঁ মেরে আসার কেমন সুন্দর সুযোগ এসে গেল, বলো?"

"কিন্তু..." মিতিনের তবু যেন ধন্দ যায় না। চোখ কুঁচকে বলল, "যত দূর জানি, এই ধরনের প্রাইজে শুধু হোটেলের খরচটাই দেয়। এরা প্লেনফেয়ারও দেবে?"

"দিচ্ছে তো। এটাই হয়তো পেঙ্গুইন রিসর্ট্‌সের মার্কেটিং স্টাইল। ওখানকার যে হোটেলে রাখবে, তাদের সঙ্গে এদের হয়তো কোলাবরেশন আছে। সিঙ্গাপুরে টুরিজম প্রোমোট করার এটাই হয়তো নতুন কায়দা।"

"হুম, হতে পারে!" মিতিন মাথা নাড়ল, "কই, চিঠিটা দেখি।"

"চিঠি তো কম্পিউটারে। আমার মেল বক্সে।"

"তোমার ই-মেল অ্যাড্রেস ওদের দিয়েছিলে বুঝি?"

"অবশ্যই। জলদি চিঠি চালাচালি করতে এখন ই-মেলই তো ভরসা। সেকেন্ডের মধ্যে দুনিয়ার যে-কোনও প্রান্তে পৌঁছে যাওয়া যায়," পার্থ সোফায় বাবু হয়ে বসল, "যাক গে, কাজের কথা শোনো। আমাদের যাত্রার সম্ভাব্য তারিখটা ওরা জানতে চেয়েছে। সেই অনুযায়ী প্লেনের টিকিট পাঠাবে। বেশি দেরি করা যাবে না, কারণ অফারটার মেয়াদ মাত্র এক মাস। আজ ২৪ মার্চ, ২৪ এপ্রিলের মধ্যে আমাদের ঘুরে আসতে হবে।"

"অসুবিধের কী আছে? বুমবুমের তো পরীক্ষা হয়েই গিয়েছে, আমারও এই মুহূর্তে হাতে কোনও কাজ নেই, আমরা নেক্সট উইকেই যেতে পারি," মিতিন যেন এতক্ষণে বেশ খুশি-খুশি।

"আমাদের তিনজনেরই তো পাসপোর্ট আছে। সিঙ্গাপুরের ভিসা পাওয়াও এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। এখন তো শুনি, সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে নেমেও ভিসা করিয়ে নেওয়া যায়। দু'-তিন দিন বেড়িয়ে এলেও মাথাটা বেশ ফ্রেশ হয়ে যাবে।"

"বটেই তো। তোমার তো এখন যা ঘোরাঘুরি, সব কাজের জন্য। স্রেফ আরাম করে বেড়ানো তোমার আর হয় কোথায়! কী রে টুপুর, ঠিক বলছি কিনা বল?"

টুপুরের বুকটা কেমন ভার-ভার ঠেকছিল। মাসি, মেসো আর বুমবুম তিন-চার দিনের জন্য বেড়াতে যাবে, এতে তো তার হিংসে জাগা উচিত নয়, তবু মনটা কেমন খচখচ করছে। উদাস গলায় টুপুর বলল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, যাও। তোমাদের সকলেরই ভাল লাগবে। খুব মজা করতে পারবে।"

পার্থ চোখ পিটপিট করল, "তুই যাবি নাকি সঙ্গে?"

"আমি কী করে যাব? ওরা তো শুধু তোমাদের তিনজনকেই..."

"সো হোয়াট? তুইও যেতে পারিস। তোর খরচ আমি দেব। পাসপোর্টও তো আছে তোর। তাই না?"

টুপুর খুশি হয়ে ঘাড় নাড়ল। গত বছর টুপুরের বাবা একটা সেমিনারে যোগ দিতে ঢাকা গিয়েছিলেন, তখনই টুপুর আর টুপুরের মা'র পাসপোর্টটাও করিয়ে রেখেছিলেন। অবনীর সঙ্গে যদিও টুপুর আর সহেলির বাংলাদেশ যাওয়া হয়নি, তবে পাসপোর্টটা তো আছে।

ঈষৎ লজ্জা-লজ্জা মুখে টুপুর বলল, "কিন্তু... স্কুল কামাই হবে... আমার সুবিধেমতো ডেটে যদি যাওয়া না হয়..."

"বকিস না তো! তিন দিন স্কুল ডুব মারলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয় না," পার্থ কাঁধ ঝাঁকাল, "জানিস, আমি প্রত্যেক মাসে নিয়ম করে চার দিন স্কুল বাঙ্ক করতাম।"

"আর রাস্তায়-রাস্তায় ডাংগুলি খেলে বেড়াতে," মিতিন ফোড়ন কাটল।

"নো। আই ওয়াজ় আ ফুটবলার। পাউরুটি, আলুরদমের বিনিময়ে কত দূর-দূরান্তে খেপ খেটে এসেছি। স্ট্রাইকার হিসেবে আমার যা নাম ছিল... সমস্ত ক্লাব আমায় খেলানোর জন্য ঝুলোঝুলি করত। বারাসত থেকে ডাকছে, উলুবেড়িয়া থেকে ডাকছে... নেহাত কলেজে উঠে ফুটবলটা ছেড়ে দিলাম, নইলে ন্যাশনাল টিমে তো আমার জন্য জায়গা বাঁধা ছিল।"

"হয়েছে, এবার গুল মারা থামাও," মিতিন দু' হাত তুলল "চটপট গিয়ে আগে ই-মেলটার জবাব দিয়ে দাও তো। লিখবে, আমাদের সঙ্গে এক্সট্রা একজন যাচ্ছে, তার এয়ারটিকিট আমরা করে নেব। আর পারলে যেন এমনভাবে ব্যবস্থা করে, যাতে মাঝে শনি-রোববারটা থাকে।"

"তুমিও তা হলে ততক্ষণে ভাল করে কফি বানিয়ে ফ্যালো। তোমার আরতিরানি কাজ সেরে যাওয়ার সময় এমন এক কাপ চা খাইয়েছে, মুখ তিতকুটে মেরে আছে।"

পার্থমেসো কম্পিউটারে বসল। মিতিনমাসি রান্নাঘরে। বুমবুম টিভিতে কার্টুন দেখছে। সিন চ্যাং। ভয়ংকর এক দুষ্টু ছেলের কাহিনি, বেশিক্ষণ তার কাণ্ডকারখানা দেখলে মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। টুপুর দু'-পাঁচ মিনিটের বেশি বসতে পারল না টিভির সামনে। পায়ে-পায়ে চলে গেল মিতিনমাসির নিজস্ব চেম্বারটায়।

এই ঘরখানায় ঢুকলেই অদ্ভুত রোমাঞ্চ জাগে টুপুরের। কত কিছু যে আছে এখানে! সম্প্রতি একটা ল্যাপটপ কিনেছে মিতিনমাসি, বাহারি ছোট্ট কম্পিউটারখানা শোভা পাচ্ছে টেবিলে। দেওয়ালজোড়া র‍্যাকে থরে-থরে বই আর বই। ইতিহাস, ভূগোল, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন, সাহিত্য, সবই অবস্থান করছে পাশাপাশি। এ ছাড়াও আছে অজস্র ফাইল। নানান কেসের। এক-একটা বিষয় ধরে খবরের কাগজের কাটিং জমায় মিতিনমাসি, সেই ফাইলও সংখ্যায় কম নয়। কোনওটায় একের পর-এক খুনের খবর। কোনওটায় শুধু কিডন্যাপিং। কিংবা জালিয়াতি, ডাকাতি। গত তিন-চার বছরের একটা অপরাধও বোধ হয় মিতিনমাসির তথ্যভাণ্ডারের বাইরে নেই। এত গুছিয়ে কাজ করে বলেই না ঝানু গোয়েন্দা হিসেবে মিতিনমাসির এত নামডাক!

বইয়ের তাক ঘেঁটে টুপুর একটা মানচিত্রের বই বের করল। পাতা উলটে-উলটে থামল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ম্যাপে। সিঙ্গাপুর খুঁজছে।

হ্যাঁ, পেয়েছে। ভারতের পরে বাংলাদেশ, তারপর মায়নমার। তারপর মগের মুলুক পেরিয়ে, আন্দামান সমুদ্র ছুঁয়ে, তাইল্যান্ডকে পাশে রেখে, মালয়েশিয়া অতিক্রম করে সিঙ্গাপুর দ্বীপ। ও-ওইখানে যাবে টুপুর?

ইস, টুপুরের বিশ্বাসই হচ্ছে না। এমন আকস্মিকভাবে সিঙ্গাপুর ভ্রমণটা আকাশ থেকে খসে পড়ল! শেষমেশ যাওয়া হবে তো সত্যি-সত্যি? এর মধ্যে দুম করে মিতিনমাসির কোনও কেস না এসে যায়!

॥ ২ ॥

নাঃ, কোনও গড়বড় হল না শেষ পর্যন্ত। পার্থ সম্মতি জানানোর তিন দিনের মধ্যেই উত্তর হাজির। এবার আর ই-মেল নয়, কুরিয়ারের মাধ্যমে। সুদৃশ্য খামে, হালকা নীলরঙা পেঙ্গুইনের একটা বড়সড় লোগো বসানো প্যাডে চিঠি পাঠিয়েছে পেঙ্গুইন রিসর্ট্স ইন্টারন্যাশনাল। পত্রের বয়ানটি সংক্ষিপ্ত, নেহাতই কেজো। 'শ্রীপার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় ও তার পরিবারকে এই ভ্রমণটি উপহার দিতে পেরে পেঙ্গুইন রিসর্ট্স কৃতার্থ বোধ করছে। তারা আশা করে, ভ্রমণটি অবশ্যই উপভোগ্য হবে। সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে তাদের প্রতিনিধি যথাসময়ে উপস্থিত থাকবে এবং হোটেলবাসের যথাযথ বন্দোবস্ত করে দেবে।'

খামে তিন-তিনখানা বিমান-টিকিটও মজুত। সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনসের। পার্থ, মিতিন, আর বুমবুমের নামে। যাওয়া ৩ এপ্রিল, শুক্রবার। ফেরা সোমবার রাতে। অর্থাৎ ঠিক যেমনটি চাওয়া হয়েছিল, তেমনটি।

ব্যস, পার্থকে আর পায় কে! আনন্দে প্রায় লাফাতে-লাফাতে কম্পিউটারে বুক করে ফেলল টুপুরের টিকিট। সিঙ্গাপুরে নেমে ভিসা করাতে গিয়ে কী ঝামেলা হয় কে জানে, এখানকার এক ট্র্যাভেল এজেন্ট বন্ধুকে ধরে একদিনেই বের করে ফেলল সিঙ্গাপুরবাসের অনুমতি। টাকা ভাঙিয়ে সিঙ্গাপুর ডলার কিনল বেশ কিছু। খাওয়াদাওয়া, ঘোরাঘুরি, কেনাকাটার খরচ তো নিজেদেরই করতে হবে। দু'-তিন দিনের জন্য পাহাড়প্রমাণ জামাকাপড়ও

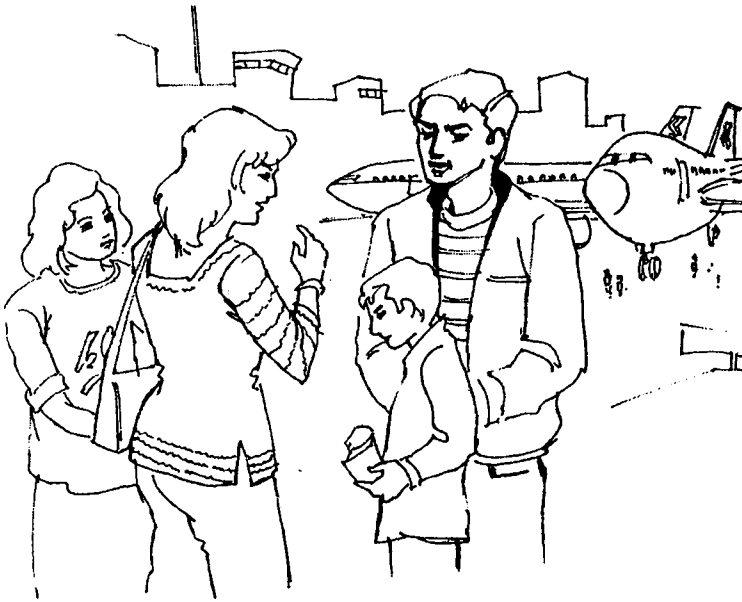

গুছিয়ে নেওয়া হল সুটকেসে। এবার শুধু উড়লেই হয়।

টুপুরও উত্তেজনায় ফুটছিল। জীবনে এই প্রথম বিদেশভ্রমণ বলে কথা! বাবা-মা'র সঙ্গে নেতাজি সুভাষ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গিয়ে যখন পৌঁছল, তখন তো টুপুরের রীতিমতো গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

ফ্লাইট রাত ১১টা ৫০-এ। টুপুরদের বিদায় জানিয়ে ফিরে গিয়েছেন অবনী আর সহেলি। শুল্কদপ্তর আর নিরাপত্তা বেষ্টনী টপকে দোতলার ঝকঝকে লাউঞ্জে এসে বসল টুপুররা। প্লেন ছাড়তে এখনও খানিক দেরি, একটু-একটু করে যাত্রীতে ভরে যাচ্ছে লাউঞ্জ। সাহেব, মেমসাহেব, চিনা, জাপানি, বাঙালি, অবাঙালি,

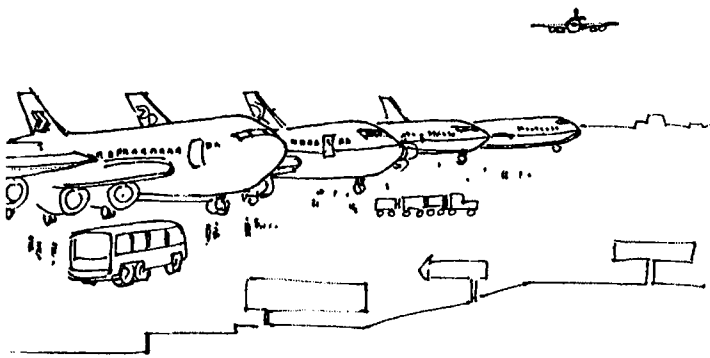

কতরকম যে লোক। কেউ বা একা বসে, কেউ গল্পগুজব করছে, কেউ বা হেঁটে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। চা-কফি স্ন্যাক্স কোল্ড ড্রিঙ্কসের ছোট্ট-ছোট্ট দোকানগুলো বন্ধ ছিল এতক্ষণ, ঝাঁপ খুলতেই কিয়স্কগুলোর কাউন্টারে খুচরো জটলা। লাউঞ্জে একটা টিভিও চলছে, সেদিকেও চোখ মেলেছে কেউ-কেউ। অনেকেরই কানে মোবাইল, দরকারি কথা সারছে টুকটাক। কোণের বিনা পয়সার টেলিফোন বুথেও হালকা লাইন।

পার্থ হাঁটতে-হাঁটতে ওই বুথের দিকেই গিয়েছিল। একবার কফিশপেও ঢুঁ মেরে এসে টুপুরকে জিজ্ঞেস করল, "কী রে, কিছু খাবি নাকি?"

টুপুরের অল্প-অল্প খিদে পাচ্ছিল। ন'টার মধ্যে এয়ারপোর্টে আসতে হয়েছে, সন্ধেবেলার লুচি-তরকারি হজম হয়ে গিয়েছে মোটামুটি। ঠোঁট কুঁচকে বলল, "কী পাওয়া যাবে?"

"পেস্ট্রি, স্যান্ডউইচ..."

"না না, ওসব এখন খেতে হবে না। প্লেনে উঠলেই তো ডিনার দেবে," মিতিন প্রস্তাবে জল ঢেলে দিল, "বরং দু'-এক প্যাকেট চিপ্‌স নাও, কফির সঙ্গে খাই।"

বুমবুম ঢুলছিল এতক্ষণ। চিপ্‌সের নাম কান যেতে সে আচমকাই চাঙা। উজ্জ্বল মুখে বলল, "আমি কিন্তু একটা গোটা প্যাকেট খাব।"

এসে গেল মুচমুচে চিপ্‌স। পার্থ আর মিতিনের কফিও। কাগজের কাপে চুমুক দিয়ে মিতিন বলল, "কী রে, কেমন দেখছিস লাউঞ্জটা? মনে হচ্ছে না একটা মিনি পৃথিবী?"

টুপুর ঘাড় নাড়ল, "হ্যাঁ, সে তো বটেই।"

"ইন্টারেস্টিং কিছু চোখে পড়ছে?"

টুপুর এদিক ওদিক ঘাড় ঘোরাল, "ওই দু'জন বুদ্ধিস্ট মঙ্কের কথা বলছ? ন্যাড়া মাথা? গেরুয়া পরা?"

"নাঃ, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় এখনও বৌদ্ধদের রমরমা। ওঁরা তো থাকবেনই।... আর কিছু?"

চিপ্‌স চিবোতে-চিবোতে আর-একবার প্রকাণ্ড হলঘরের মতো জায়গাটাকে নিরীক্ষণ করল টুপুর। আমতা-আমতা করে বলল, "কই, সেভাবে তো..."

"আমার অবজারভেশনটা বলব?" পার্থ ফুট কাটল, "ওই যে টেলিফোন বুথের সামনে তিনটে লোক দাঁড়িয়ে... ওরা মনে হচ্ছে একটু সন্দেহজনক। সম্ভবত ওরা ক্যারিয়ারের কাজ করে।"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "সেটা কী?"

"সিঙ্গাপুর থেকে নানা ধরনের জিনিসপত্র কিনে এনে এখানকার

বাজারে বেচা হয়। এই ধর, ফ্যান্সি মার্কেটে, বাগরি মার্কেটে... কেনাকাটা আর চোরাপথে মাল আনার বন্দোবস্ত করে এই সব ক্যারিয়াররা। এদের পিছনে থাকে বড় কোনও ব্যবসায়ী বা স্মাগলার। লাভের গুড় সেই লোকটাই খায়, এরা ক্যারি করে আনার জন্য কিছু পয়সা পায় শুধু।"

"কী কাণ্ড, কাস্টমস এদের ধরে না?"

"কখনও ধরা পড়ে, কখনও বেরিয়ে যায়। ওই ঝুঁকিটুকুর জন্যই তো টাকা দেওয়া হয় ওদের।"

লোক তিনটেকে ভাল করে দেখল টুপুর। চেহারায় এমন কিছু বিশেষত্ব নেই। বয়স পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। পোশাক-আশাকও নিতান্ত সাধারণ। নিজেদের মধ্যে হাত নেড়ে-নেড়ে গল্পগুজব করছে লোকগুলো। টুপুরের মনে পড়ল, শুল্ক দপ্তরের অফিসাররা এদের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছিলেন। জেরা করছিলেন কি? হবেও বা।

ভাবনাটার সঙ্গে-সঙ্গে আর-একটা প্রশ্নও উঁকি দিয়েছে টুপুরের মাথায়। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা পার্থমেসো, এরা কি নিষিদ্ধ ড্রাগটাগও নিয়ে আসে? ওই যে কাগজে মাঝে-মাঝে বেরোয়, দমদম বিমানবন্দরে কোকেন বা হেরোইন ধরা পড়েছে..."

"হ্যাঁ, ওসব দ্রব্যও তো ক্যারিয়াররাই বহন করে আনে," এবার পার্থর বদলে মিতিনের জবাব, "তবে সিঙ্গাপুর থেকে ড্রাগ আনা ভীষণ কঠিন।"

"কেন?"

"ড্রাগের ব্যাপারে সিঙ্গাপুর গভর্নমেন্ট সাংঘাতিক কড়া। ড্রাগসমেত কেউ সেখানে ধরা পড়লে তার একটাই শাস্তি। ডেথ, প্রাণদণ্ড। অতএব খেয়াল রেখো... এটা শুধু তোমাকে নয়, তোমার মেসোকেও বলছি, সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে নিজের হ্যান্ডব্যাগটি

সম্পর্কে সাবধান। আত্মভোলা হয়ে থাকলে চলবে না। ড্যাবড্যাব করে ডিউটি-ফ্রি শপে জিনিস দেখছ... পুট করে কেউ ব্যাগে একটা প্যাকেট গুঁজে দিল... ব্যস, তা হলেই তুমি গেলে।"

"এই শর্মা মোটেই অত ক্যালাস নয়," পার্থ কাঁধ ঝাঁকাল, "সুডোকু প্র্যাকটিস করার পর থেকে আমার চোখ-কান আরও অনেক বেশি খুলে গিয়েছে।"

"দ্যাট্স গুড। কফি শেষ করে কাগজের কাপটা পার্থর হাতে ধরিয়ে দিল মিতিন, "এটা বিনে ফেলে এসো তো।"

বুমবুম বলল, "আমায় দাও। আমি ফেলে আসছি।"

ফাঁকা কাপদুটো নিয়ে দৌড় লাগাল বুমবুম। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে উলটো দিকের সোফায় বসে থাকা এক ভদ্রলোক উঠে এসেছেন। পার্থর চেয়ে খানিক বড়ই হবেন বয়সে। শ্যামলা রং, গাট্টাগোট্টা চেহারা, হাইট মাঝারি, মাথায় অল্প টাক। পরনে কালো ট্রাউজার্স আর আকাশি নীল বুশশার্ট। অনেকক্ষণ থেকেই এদিকে তাকিয়ে ছিলেন ভদ্রলোক, বারকয়েক চোখাচোখিও হয়েছে টুপুরের সঙ্গে, টুপুর তেমন আমল দেয়নি।

ভদ্রলোক বিনীত স্বরে পার্থকে বললেন, "এক্সকিউজ় মি। আপনাকে খুব চেনা-চেনা লাগছে। আগে কোথাও আমাদের দেখা হয়েছে কি?"

পার্থ থতমত খেল সামান্য। বলল, "না মানে... আমি তো ঠিক... মনে করতে পারছি না।"

"যদি কিছু মনে না করেন... আপনার নামটা জানতে পারি?"

"পার্থপ্রতিম মুখার্জি।"

নামটাকেও বুঝি মনে-মনে হাতড়ালেন ভদ্রলোক। মাথা নেড়ে বললেন, "কিন্তু আমার যে খুব... আচ্ছা, আপনি কি সেন্ট পল্স স্কুলে পড়তেন?"

"না তো। আমি সেন্ট কালী," বলেই পার্থ একগাল হাসল, "আমি কালীপ্রসাদ বিদ্যামন্দিরের ছাত্র ছিলাম।"

"ও। তা হলে কি কর্মসূত্রে কোথাও...?"

"আপনি কোথায় কাজ করেন?" পার্থ চোখ সরু করল।

"আমার কাপড়ের ব্যাবসা। বড়বাজারের পগেয়াপট্টিতে। আপনি কি যান ওদিকে?"

"না তো। আমি বউবাজারে একটা ছোট প্রেস চালাই। ক্যানিং স্ট্রিটে যাই মাঝে-মাঝে। কাগজ কিনতে।"

"ও। তা হলে হয়তো শিয়ালদা-টিয়ালদা কোথাও... আমি শিয়ালদা হয়েই বাড়ি ফিরি তো।"

"হতে পারে। আবার হয়তো আমি নয়, আমার মতো আর কাউকে দেখেছেন। একই টাইপের ফেসকাটিং তো আরও থাকতে পারে।"

"তাই কি?" ভদ্রলোকের তবু যেন ধন্দ যাচ্ছে না। চোখ পিটপিট করে বললেন, "আচ্ছা... বাই এনি চান্স... আপনি কি আমহার্স্ট স্ট্রিটের দিকে থাকতেন কখনও? বা মানিকতলার কাছাকাছি?"

"না না, আমি বরাবর দক্ষিণ কলকাতায়। আগে ভবানীপুরে ছিলাম, এখন ঢাকুরিয়ায়।"

"তা হলে বোধ হয় ঢাকুরিয়াতেই আপনাকে দেখেছি। প্রায়ই তো ঢাকুরিয়া যাই। আমার এক মাসির বাড়ি। ওই পাড়াতেই সম্ভবত..."

"আপনার মাসির বাড়ি কোথায়? স্টেশনের এপার? না ওপার?"

"স্টেশনের পশ্চিম দিকে। বাবুবাগান।"

"আমরা থাকি পুবে। শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোডে।" পার্থ একগাল হাসল, "একমাত্র শিয়ালদা টু ঢাকুরিয়া ট্রেন ছাড়া আমাদের দেখা হওয়ার কিন্তু সম্ভাবনা খুব কম।"

"তাই হবে। হয়তো ট্রেনে, কিংবা রাস্তায়..." ভদ্রলাক এবার যেন

একটু লজ্জিত, "সরি, মিছিমিছি আপনাকে বিরক্ত করলাম।"

"আরে না, আমি একদমই মাইন্ড করিনি। বরং ভালই তো, আলাপ পরিচয় হয়ে গেল।"

"তা ঠিক। নতুন-নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে আমারও বেশ লাগে।" ভদ্রলোক হাসলেন, "আপনারা কদ্দুর চললেন? সিঙ্গাপুর? নাকি ভায়া সিঙ্গাপুর অন্য কোথাও?"

"আমাদের দৌড় সিঙ্গাপুর পর্যন্তই।"

"বেড়াতে?"

"ওই আর কী! আলটপকা একটা সুযোগ জুটে গেল, ভাবলাম ঘুরেই আসি।"

"বেশ করেছেন। সিঙ্গাপুর ভারী সুন্দর শহর। ...ক'দিন থাকছেন তো?"

"তিন দিন, দু' রাতের প্যাকেজ টুর।"

"আই সি। তার মানে কোনও ট্র্যাভেল কোম্পানির সঙ্গে যাচ্ছেন? ওরাই ঘোরাবে?"

"ঠিক তা-ও নয়। আমরা নিজেরাই ঘুরব ফিরব। পেঙ্গুইন কোম্পানি শুধু আমাদের হোটেলের ব্যবস্থাটা করে দেবে।"

"পেঙ্গুইন?"

"পেঙ্গুইন রিসর্ট্স ইন্টারন্যাশনাল। নাম শুনেছেন?"

"মনে হচ্ছে, শোনা-শোনা। আপনাকে যেমন দেখা-দেখা মনে হচ্ছিল।" বলেই ভদ্রলোক দরাজ গলায় হেসে উঠলেন, "আমার এই এক বদরোগ, বুঝলেন। হঠাৎ-হঠাৎ কোনও মানুষকে চেনা-চেনা মনে হয়। অথবা কোনও নাম শুনেই মনে হয় শোনা-শোনা। আমার মা বলেন..."

ভদ্রলোকের মা কী বলেন তা আর শোনা হল না। বোর্ডিং গেট খুলে গিয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে লাউঞ্জে চকিত ব্যস্ততা। সিট নম্বর

অনুযায়ী ডাক চলছে মাইক্রোফোনে, সুড়ঙ্গপথের মতো লম্বা এয়ারব্রিজে একে-একে ঢুকে পড়ছে যাত্রীরা।

প্লেনের গেটে বিমানসেবিকাদের সুস্বাগতম পেরিয়ে টুপুররা নিজেদের সিটে এসে বসল। প্রকাণ্ড উড়োজাহাজ। প্রতিটি সারিতে দশজনের বসার জায়গা। দু' দিকে জানলার ধারে তিন তিন ছয়, মধ্যিখানে চার। রাত্রিবেলা বাইরে কিছু দেখার নেই, তার উপর বসাও যাবে একসঙ্গে, তাই ভেবেচিন্তে মাঝের সিটই নিয়েছে পার্থ।

কাঁটায়-কাঁটায় এগারোটা পঞ্চাশে রানওয়ে ধরে ছুটল প্লেন। টুপুরের বিমানযাত্রা এই প্রথম নয়, গত বছরই মুম্বই যাতায়াত করেছিল আকাশপথে। তবু বিমান আকাশে উড়তেই বুকে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ। শরীর যেন হালকা হয়ে গেল সহসা। এবার কানে তুলো লাগাব-লাগাব করেও লাগায়নি শেষ পর্যন্ত। একটু পরে কানদুটো যেন ভোঁ-ভোঁ করতে লাগল। একে নাকি বলে হাই অল্টিটিউড সিনড্রোম। পার্থমেসোর ভাষায়, 'উঁচুতে ওঠার গেরো।' প্লেন নীচে নামার পরেও নাকি বেশ খানিকক্ষণ থেকে যায় ভোঁ-ভোঁ ভাব। কান কটকটও করে কখনও কখনও।

মিতিনমাসির পরামর্শমতো বেশ খানিকক্ষণ শ্বাস ধরে রেখে, ছাড়া-নেওয়া করে কান দুটোকে সমে ফেরাল টুপুর। সিটবেল্ট খোলার সংকেত পেয়ে ভাল করে গুছিয়ে বসেছে। প্লেন ছাড়ার আগেই হেডফোন বিলি করা হয়েছিল যাত্রীদের, যন্ত্র কানে লাগিয়ে বুমবুম চোখ রেখেছে সামনের সিটের পিঠে লাগানো খুদে মনিটরে। কার্টুন দেখছে। মিতিনমাসিই চালিয়ে দিয়েছে। টুপুর, মিতিনমাসি, আর পার্থমেসোর সামনে, মনিটরে, ফুটে উঠেছে বিমানের যাত্রাপথ। এখন বিমান ঠিক কোথায়, কতটা উচ্চতায়, সেখানকার তাপমাত্রাই বা কত, সবই দেখা যাচ্ছে পরদায়।

কোল্ড ড্রিঙ্কস আর চানাচুরের প্যাকেট দিয়ে গেল হাস্যমুখ

বিমানসেবিকা। আর-একটু পরে বুঝি নৈশাহার দেবে। বুমবুমের চানাচুর নিমেষে শেষ, হাত বাড়িয়েছে টুপুরের প্যাকেটে। পার্থও চিবোচ্ছে কচরমচর করে। মেনুকার্ডটা উলটেপালটে দেখে নিয়ে বলল, "আমি কিন্তু সেদ্ধ-সেদ্ধ কন্টিনেন্টাল খাব না।"

মিতিন মুচকি হেসে বলল, "সে তো আমি জানি। সাধে কি তোমায় ভেতো বলি!"

"ভাতকে অত হেলাফেলা কোরো না ম্যাডাম। জাপানিরা ভাত খায় বলেই এত কর্মঠ। এত বুদ্ধিমান। ইন ফ্যাক্ট, ভাতের জন্যই আমার অঙ্কে এত মাথা!"

"শুধু ক'টা সংখ্যা মেলানো অঙ্ক নয়, স্যার। একটা পয়েন্ট থেকে অন্য পয়েন্টে পৌঁছনোটাও অঙ্ক। আর সে ব্যাপারে তোমার মগজ টুঁটু।"

"কী করে বুঝলে?"

"তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে। একটা সম্পূর্ণ অচেনা লোক তোমার পেট থেকে যাবতীয় খবর নিয়ে চলে গেল, অথচ তুমি তার সম্পর্কে কিছুই জানার চেষ্টা করলে না!"

"কেন, জেনেছি তো। উনি একজন বস্ত্রব্যবসায়ী। বড়বাজারে দোকান।"

"ব্যস, ওইটুকুই। বলো তো, ভদ্রলোকের নাম কী?"

পার্থ একটুক্ষণ মাথা চুলকোল। তারপরই গুম। ঘাড় উঁচিয়ে দেখল এদিক-ওদিক। হঠাৎই সিট ছেড়ে উঠে গেছে। ভদ্রলোককে খুঁজে বের করে দাঁড়িয়ে পড়ল সেখানে।

টুপুর সভয়ে বলল, "সর্বনাশ, পার্থমেসোকে তুমি রাগিয়ে দিলে তো! এখন ভদ্রলোককে না উলটোপালটা প্রশ্ন করে বসে।"

"ছাড় তো," মিতিন পাত্তাই দিল না। ছোট্ট মনিটরে আঙুল রেখে বলল, "এদিকে তাকা। দ্যাখ, আমরা বাংলাদেশ পেরিয়ে এখন

বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে যাচ্ছি। কাছাকাছি ল্যান্ড এখন মায়ানমার।"

"মানে মগের মুলুক?"

"হুম। বর্মায় আগে কত বাঙালি থাকত, জানিস? একসময় তো ধুয়ো ছিল, এদেশে কিছু হচ্ছে না, বর্মা পাড়ি দাও। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রই তো বাড়ি থেকে পালিয়ে বর্মা চলে গিয়েছিলেন। ওখানকার মান্দালয় জেলে আমাদের এখানকার স্বাধীনতাসংগ্রামীদের রাখা হত।"

টুকটাক ইতিহাস আর ভূগোল নিয়ে কথা চলছিল। আলোচনা পুরোপুরি জমে ওঠার আগেই পার্থ ফিরে এসেছে। ধপাস করে সিটে বসে তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, "পেট থেকে কথা আমিও বের করতে পারি।"

মিতিন চোখ দিয়ে ইশারা করতেই টুপুর জিজ্ঞেস করল, "কী-কী জানলে গো পার্থমেসো?"

"এভরিথিং। ভদ্রলোকের নাম, সুজিত দত্ত। থাকেন সোদপুরে। এইচ-বি টাউনে। পগেয়াপট্টির দোকানটা ওঁর ঠাকুরদার আমলের। দোকান ছাড়াও সুজিতবাবুর আর-একটা ব্যাবসা আছে। এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের। সেই কাজেই বছরে বেশ কয়েকবার সিঙ্গাপুরে যেতে হয় ওঁকে। বিয়ে-থা করেননি। অত্যন্ত মাতৃভক্ত। বাবা হঠাৎ সেরিব্রাল অ্যাটাকে মারা যাওয়ার পর মা ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু বোঝেন না।" পার্থ তেরচা চোখে মিতিনকে দেখল, "কী, আর কিছু জানতে চাও?"

"না। তবে ইনফরমেশনগুলো সত্যি না মিথ্যে, তা তো বোঝার উপায় নেই।"

"মানে? তুমি বলতে চাও, ভদ্রলোক মিথ্যে বললেন?"

"হতেও পারে। যাচাই করার তো কোনও উপায় নেই।"

"খামোকা উনি বানিয়ে-বানিয়ে বলবেন কেন?"

"সে আমি কী করে বলব! জাস্ট মনে হল, তাই..."

পার্থ গোমড়া মুখে বলল, "টুপুর, তোর মাসির স্বভাবটা বেজায় কুচুটে হয়ে গিয়েছে। সব ব্যাপারে টিকটিকিপনা করা চাই। ভাল্লাগে না।"

মিতিন হেসে ফেলল, "রাগ করছ কেন? ঠেকেছি তো দু'-একবার, তাই ভয় হয়। হঠাৎ কোনও উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে বেড়ানোর অর্ধেকটাই তো মাটি।"

টুপুর ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "ভদ্রলোককে কি তোমার উটকো ঝামেলা মনে হচ্ছে?"

"বলতে পারছি না রে, না হলেই তো মঙ্গল!"

॥ ৩ ॥

কলকাতা থেকে সিঙ্গাপুর অনেকটাই পুবে। সময়ের হিসেবে আড়াই ঘণ্টা এগিয়ে। অর্থাৎ কলকাতায় যখন রাত বারোটা, সিঙ্গাপুরে রাত আড়াইটে। অতএব প্রায় চার ঘণ্টা আকাশপথে পাড়ি দিয়ে প্লেন যখন সিঙ্গাপুরের চাংগি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামল, সেখানে তখন সকাল ছ'টা কুড়ি।

এয়ারব্রিজ থেকে বেরিয়ে, ইমিগ্রেশন কাউন্টার অবধি যেতে গিয়ে টুপুর বেজায় মুগ্ধ। ম্যাপে সিঙ্গাপুর একটা ফুটকির মতো দেশ, তার কী পেল্লাই এয়ারপোর্ট! ভিতরে, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়ার জন্য, চলমান রাস্তা। কাচ ঘেরা অজস্র লাউঞ্জ। অগুনতি বোর্ডিং গেট। কাচের ওপারে, গুমটিতে দাঁড়িয়ে থাকা বাসের মতো

সার-সার এরোপ্লেন দেখা যায়। ডিউটি ফ্রি শপের এলাকাও কী বিশাল! কত কিসিমের যে ঝলমলে দোকান সেখানে। সব মিলিয়ে কার্পেট মোড়া বিমানবন্দরের অন্দরটি রীতিমতো চোখ ধাঁধানো।

পাসপোর্ট ভিসা পরীক্ষার জায়গাটা নীচে। চলন্ত সিঁড়ি ধরে নামতে হয়। ছোট-ছোট লাইন পড়েছে সেখানে। কাউন্টারের কর্মীরা বেশ চটপটে, কাজ হচ্ছে দ্রুত। লাইন থেকেই টুপুর দেখতে পেল তাদের আগে বেরিয়ে গেলেন সুজিত দত্ত। টুপুরদের দিকে সেভাবে ফিরেও তাকালেন না। লাগেজ সংগ্রহের সময়ে তাঁকে এদিক-ওদিক খুঁজল টুপুর। চোখে পড়ল না। এবারও আগেই চলে গিয়েছেন।

টুপুর মনে-মনে হাসল একটু। প্লেনে পার্থমেসো কীভাবে জেরা করেছেন কে জানে, তারপর থেকে ভদ্রলোক আর তাদের দিকে ঘেঁষছেনই না। বুঝি টের পেয়েছেন, তাঁর গায়েপড়ে ভাব জমানোটা টুপুরদের পছন্দ হয়নি। ভদ্রলোককে মিছিমিছি সন্দেহ করারও বোধ হয় কোনও মানে হয় না। পার্থমেসোই ঠিক। ডিটেকটিভরা দড়িকে সাপ বলে ধরে নেয়।

কাস্টম্‌সের গণ্ডি পেরোতেও সময় লাগল না বিশেষ। ব্যাগ-সুটকেস ট্রলিতে বসিয়ে ঝাঁ-চকচকে এয়ারপোর্টটার বাইরের দিকে এল টুপুররা। পার্থমেসোর পিছু-পিছু। অনেক মানুষ অপেক্ষা করছে এখানে। কারও হাতে নাম লেখা প্ল্যাকার্ড, কেউ বা সন্ধানী চোখে তাকাচ্ছে ইতিউতি। কিন্তু পেঙ্গুইনের লোক কোথায়?

এতক্ষণ পার্থ দারুণ সপ্রতিভ ছিল, এবার যেন ফাঁপরে পড়েছে। ঈষৎ উদ্‌ভ্রান্তের মতো টুপুরকে বলল, "কী রে, আমার নাম লেখা কোনও বোর্ড দেখছি না যে?"

"তাই তো। যদি কেউ নিতে না আসে কী হবে?"

"ঘাবড়াচ্ছিস কেন? আমরা কি জলে পড়ে গিয়েছি?" বুমবুমের হাত শক্ত করে ধরে থাকা মিতিন অভয়বাক্য শোনাল, "একেবারে

AIRPORT

খালি হাতে তো আসিনি। সিঙ্গাপুরের ট্যাক্সি সার্ভিসের খুব সুনাম। টুরিস্টদের সচরাচর ঠকায় না। তেমন বুঝলে ট্যাক্সি পাকড়াও করে ভাল কোনও হোটেলে চলে যাব।"

তার অবশ্য দরকার হল না। হঠাৎই যেন মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হলেন এক ভদ্রলোক। বয়স বছর পঞ্চাশ। কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল। গায়ের রং আবলুশ কাঠের মতো কালো। মুখখানা যেন শুকনো লিচুর আঁটি। পরনে কালো সুট, কটকটে লাল রঙের টাই।

ব্যস্তসমস্তভাবে ভদ্রলোক বললেন, "আই হোপ ইউ আর মিস্টার পি পি মুখার্জি? ফ্রম ক্যালকাটা?"

পার্থ গম্ভীরস্বরে বলল, "ইয়েস।"

"আয়্যাম ফ্রম পেঙ্গুইন রিসর্ট্স ইন্টারন্যাশনাল," ভদ্রলোক ঝুঁকলেন সামান্য। দক্ষিণ ভারতীয় টানে ইংরেজিতে বললেন, "অনুগ্রহ করে আমাদের সংস্থার আমন্ত্রণপত্রটি দেখাবেন কি?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই," পার্থ কাঁধের ব্যাগ থেকে খাম বের করে দিল। মুখটা খুলে ভদ্রলোক আলগা চোখ বোলালেন চিঠিতে। তারপর চিঠিসুদ্ধ খাম চালান করলেন কোটের পকেটে। করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে গদগদ মুখে বললেন, "ওয়েলকাম স্যার, পেঙ্গুইন রিসর্ট্স ইন্টারন্যাশনালের পক্ষ থেকে আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে সিঙ্গাপুরে সুস্বাগতম। আমি কি আপনাদের অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি?"

"খুব বেশি নয়, মিনিটদশেক।"

"সরি স্যার। দেরি হওয়ার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত ... আসুন, আপনাদের গাড়ি রেডি আছে।"

গাড়িটা জাপানি। চেহারাটি নয়নলোভন। গাড়িতে ওঠার আগে মোবাইল ক্যামেরায় টুক করে গাড়িটার একটা ছবি তুলে নিল পার্থ। তারপর বসল সামনের সিটে। দরজা খুলে ভদ্রলোকও উঠেছেন।

পার্থর পাশে। চালকের আসনে। পিছনে টুপুর, মিতিন, বুমবুম। আকাশে বুমবুমের ঘুম তেমন জুতসই হয়নি, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়িতে ওঠামাত্র সে চোখ বুজে ফেলল।

এয়ারপোর্ট ছেড়ে বেরিয়ে এল গাড়ি। প্রথমটা ভদ্রলোক চুপচাপই ছিলেন, পার্থর কৌতূহলের তোড়ে মুখ খুললেন ধীরে-ধীরে। দিব্যি জমে গেল আলাপ। ভদ্রলোক তামিল। নামটি বিশাল। কুম্ভকনম শ্রীনিবাসরাঘবন সৌম্যনারায়ণ। বারবার আউড়েও নামটা গুলিয়ে ফেলছিল পার্থ। অবশেষে ভদ্রলোকই সরল করে দিলেন। বললেন, তাঁকে কে এস এস বলেও ডাকা যেতে পারে। কিংবা শুধু নারায়ণ।

কথায়-কথায় জানা গেল চাকরিসূত্রে ভারতের অনেক জায়গায় ঘুরেছেন ভদ্রলোক। আপাতত কর্মসূত্রে সিঙ্গাপুরে আছেন বছরপাঁচেক। কলকাতাতেও নাকি ছিলেন কিছুদিন। সেই সূত্রেই ভাঙা-ভাঙা বাংলা বলতে পারেন। বোঝেনও মোটামুটি।

জানলার বাইরে চোখ মেলে, অচেনা শহরটাকে দেখতে-দেখতে নারায়ণের কথা শুনছিল টুপুর। কী চমৎকার চওড়া-চওড়া মসৃণ রাস্তাঘাট। দু' ধারে একের পর এক আকাশছোঁয়া অট্টালিকা। তবে শুধু ইটকাঠের জঙ্গল নয়, মাঝে-মাঝেই ঘন সবুজেরও দর্শন মিলছে। কোথাও এতটুকু ধুলোময়লা নেই। সবে সওয়া সাতটা, এর মধ্যেই অসংখ্য গাড়ি বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। মাপা গতিতে ছুটছে তারা। নিঃশব্দে। হর্ন না বাজিয়ে। চমৎকার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা। কোথাও কোনও পথচারী যেমন-তেমনভাবে রাস্তা পার হচ্ছে না। ফুলে ভরা বোগেনভেলিয়ার লতায় সাজানো ফুটব্রিজ রয়েছে কিছু দূর অন্তর-অন্তর, ওই সেতু ধরেই পথ পারাপার করছে মানুষ। এমন ছবির মতো শহর দেখলে মনটা এমনিই কেমন ভাল হয়ে যায়!

টুপুর আপন মনে বলে উঠল, "সিঙ্গাপুর তো সত্যিই ভারী সুন্দর!"

প্রশংসাটা নারায়ণের পছন্দ হয়েছে। খুশি-খুশি মুখে বললেন, "অবশ্যই সুন্দর। তবে তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে এমনটি ছিল না। এখন সিঙ্গাপুর নিজ গুণে সারা দুনিয়ার নজর কেড়েছে।"

"সত্যি, কী ছিল সিঙ্গাপুর আর কী হয়েছে!" ঘুমন্ত বুমবুমের মাথা কাঁধে টেনে নিয়ে মিতিন বলে উঠল, "এক সময় তো এখানে চুরি-ছিনতাই খুনখারাপি লেগেই থাকত। ঠগ জোচ্চোরের ভয়ে লোকে সিঙ্গাপুরে আসতেই চাইত না।"

পার্থ বলল, "আহা, অতটা বদনাম কোরো না। হাল খারাপ হয়েছিল ঠিকই, তবে সে তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে। যখন জাপানিরা ব্রিটিশদের হারিয়ে সিঙ্গাপুরের দখল নিয়েছিল। তার আগে এই রকম ঠাটবাট না থাকলেও শহরটার কিন্তু নাম ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় বন্দরগুলোর একটা বলে কথা। সিঙ্গাপুর থেকে কোথায় না জাহাজ ছাড়ত তখন!"

"সে তো এখনও যায়। শুধু জাহাজ নয়, উড়োজাহাজও।"

"তবে বন্দরটা আরও বড় হয়েছে ম্যাডাম," নারায়ণ মিটিমিটি হাসছেন, "পৃথিবীর খুব কম মালবাহী জাহাজই বলতে পারবে, সে কখনও সিঙ্গাপুর ছোঁয়নি। প্লাস, এখানে এখন কত ইন্ডাস্ট্রি। জাহাজ তৈরির কারখানা, অয়েল রিফাইনারি, ইস্পাত... এ ছাড়া বিশাল-বিশাল শপিং সেন্টার... ইলেকট্রনিক গুড্‌স তো এখানে অনেক সস্তায় পেয়ে যাবেন।"

পার্থ টুপুরের দিকে ঘুরে বলল, "মাইন্ড ইট, সিঙ্গাপুরের এত উন্নতি কিন্তু হয়েছে গত তিরিশ-চল্লিশ বছরেই।"

"ঠিক বলেছেন," নারায়ণ সায় দিলেন, "জাপানিরা শহরটাকে ধ্বংস করে দিয়ে গিয়েছিল। শুধু একজন মানুষ দেশটাকে নতুন করে গড়ে তুললেন।"

মিতিন বলল, "আপনি নিশ্চয়ই লি-কোয়ান-ইউয়ের কথা বলছেন?"

"ইয়েস ম্যাডাম। প্রচুর ঝড়ঝাপটা গিয়েছে সিঙ্গাপুরের উপর দিয়ে। জাপানিরা হটে যাওয়ার পর আবার এল ব্রিটিশ শাসন। তারপর বেশ কিছুদিন খিচুড়ি অবস্থা। এক সময় সিঙ্গাপুর ঢুকে গেল মালয়েশিয়ার মধ্যে। সেখান থেকে পুরোপুরি স্বাধীনতা এল ১৯৬৫-তে। আর তখন থেকেই লি-কোয়ান-ইউ শক্ত হাতে হাল ধরলেন সিঙ্গাপুরের। এখানকার স্থানীয় মানুষদের মুখে তো গল্প শুনি, তিনিই নাকি সিঙ্গাপুরের বাসিন্দাদের স্বভাবচরিত্র পুরো বদলে দিয়েছেন।"

"কী রকম? কী রকম?" টুপুর কৌতূহলী হল।

"বলে শেষ করা যাবে না," নারায়ণ নিপুণ হাতে গাড়ি বাঁয়ে ঘোরালেন, "ছোট একটা উদাহরণ দিই। সিঙ্গাপুরে চিনারাই সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। প্রায় সত্তর ভাগ। তাদের একটা অভ্যেস ছিল যত্রতত্র থুতু ফেলার। এখন এই দ্বীপে একটা চিনাকেও তুমি খুঁজে বের করতে পারবে না, যে রাস্তায় থুতু ফেলছে।"

"জানি," মিতিন মাথা নাড়ল, "এককালে নিয়ম না মানার জন্যই সিঙ্গাপুর কুখ্যাত ছিল। এখন সর্বত্রই এখানে নিয়মের শাসন। কেউ পথঘাট নোংরা করে না, ট্রাফিক আইন অমান্য করে না, কোথাও কোনও বেচালপনা নেই, রাত দুপুরেও যেখানে ইচ্ছে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ানো যায়..."

"তাই নাকি?" পার্থ ঠাট্টা জুড়ল, "সিঙ্গাপুরকে কি তা হলে স্বর্গরাজ্য বলতে পারি?"

"প্রায়। তবে এমনই এমনই হয়নি। এখানে ঠেলার নাম বাবাজি। এ দেশে আইন এমনই কঠোর যে, ভয়ে আইন মানে লোকে। অন্যায় করলে শাস্তি তোমায় পেতেই হবে। সে তুমি যত শাহেনশা লোকই

হও না কেন," মিতিন বুমবুমের চুলে বিলি কাটছে, "একটা ঘটনার কথা বলি শোনো। মাইকেল ফে নামে এক আমেরিকান ছেলে জাস্ট মজা করে একটা দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির গায়ে আঁচড় কেটেছিল। এখানে রাস্তায়-রাস্তায় লুকনো ক্যামেরা থাকে, ছেলেটি ওই ক্যামেরায় ধরা পড়ে যায়। শাস্তি হয়, কুড়ি ঘা বেত মারা হবে তাকে। খবর রটে যেতেই চারদিকে হইহই, আমেরিকারও মাথায় হাত। একজন আমেরিকান সিঙ্গাপুরের মতো এক পুঁচকে দেশের বিচারে প্রকাশ্যে বেত খাবে? স্বয়ং আমেরিকান প্রেসিডেন্ট লি-কোয়ান-ইউকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন, মাইকেল ফে-কে যেন ছেড়ে দেওয়া হয়। লি-কোয়ান-ইউয়ের সাফ জবাব, 'অসম্ভব। আমাদের দেশে আইন ইজ আইন। তবে হ্যাঁ, প্রেসিডেন্ট যখন অনুরোধ করছেন, তাঁর সম্মান রক্ষার্থে বেতটা আস্তে মারা হবে।'"

"তুমি এই গপ্পো জানলে কোত্থেকে?" পার্থর ভুরুতে ভাঁজ, "আগে বলোনি তো?"

"মন দিয়ে নিউজ় পেপার পড়তে হয়, স্যার। শুধু শব্দজব্দ আর সুডোকুর জন্য তো কাগজ কেনা হয় না।"

"কবে বেরিয়েছিল কাগজে?"

"বিল ক্লিন্টন তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।"

"ধুৎ, গুল মারছ," পার্থর তবু অবিশ্বাস যায় না, "কী মিস্টার নারায়ণ, আপনি শুনেছেন গল্পটা?"

"মনে করতে পারছি না। তবে ম্যাডাম যখন বলছেন, হতেও পারে," নারায়ণ এবার ডান দিকে গাড়ি ঘোরালেন। অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তায় ঢুকেছেন। ভিড়-ভিড় এলাকা। গাড়ির গতি কমিয়ে বললেন, "ম্যাডাম দেখছি খবরটবর রাখেন খুব? সাংবাদিকতার পেশায় আছেন নাকি?"

"না না, ও তো প্রফেশনাল..."

পার্থ পরিচয়টা দেওয়ার সুযোগ পেল না, তার আগেই মিতিনের প্রশ্ন, "আসল খবরটাই তো এখনও জানা হয়নি মিস্টার নারায়ণ। আমরা উঠছি কোথায়?"

"কার্লটন হোটেল।"

"সেটা কোথায়?"

"লিটল ইন্ডিয়ায়," নারায়ণের স্বরে পেশাদারি ভদ্রতা, "আমাদের ভারতীয় অতিথিরা লিটল ইন্ডিয়ায় থাকাই পছন্দ করেন।"

"অভারতীয় অতিথিও আসেন বুঝি?"

"অবশ্যই। সুডোকুর প্রতিযোগিতা পৃথিবীর অনেক শহরেই চলে। নিউ ইয়র্ক, সিডনি, টোকিও, লন্ডন... পেঙ্গুইন রিসর্ট্স ইন্টারন্যাশনাল শুধু নামেই নয় ম্যাডাম, কাজেও আন্তর্জাতিক। এই তো, আপনাদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আমি এক জাপানি দম্পতিকে রিসিভ করতে যাব।"

বলতে-বলতে গাড়ির গতি আরও কমিয়েছেন নারায়ণ। বাঁয়ে হোটেল কার্লটনের সাইনবোর্ড। বড়সড় কম্পাউন্ডটায় ঢুকে গাড়ি হোটেলের দোরগোড়ায় থামল। নারায়ণ নেমে নিজের হাতে দরজা খুলে ধরেছেন, "আসুন আপনারা, প্লিজ।"

প্রথম দর্শনেই হোটেলটা বেশ মনে ধরে গেল টুপুরের। সামনে অর্ধবৃত্তাকার লন, আর ফুলের বাগান দিব্যি শোভা এনে দিয়েছে বহিরঙ্গে। চারতলা বিল্ডিংটাও বেশ নতুন-নতুন। শ্বেত পাথরের সিঁড়ি, শ্বেত পাথরের মেঝে... নাঃ, পেঙ্গুইন ইন্টারন্যাশনাল খুব-একটা আজেবাজে জায়গায় রাখছে না।"

একতলার ১০৪ নম্বর রুমে টুপুরদের ঢুকিয়ে দিয়ে নারায়ণ বিদায় নিলেন। নিজের মোবাইল নম্বরও দিয়ে গেলেন যাওয়ার আগে। পরশু সন্ধে অবধি এই হোটেলই এখন টুপুরদের আস্তানা।

ঘরে এসে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে বুমবুমকে। টুপুরও পাশে গড়িয়ে পড়ল। মিতিন ঘুরে ঘুরে দেখে নিচ্ছে টয়লেট, অ্যান্টি রুম। কাঠের দেওয়াল-আলমারিতে ব্যাগ সুটকেস রেখে দিয়ে বড় করে আড়মোড়া ভাঙল পার্থ। চোখ টিপে জিজ্ঞেস করল, "কী রে টুপুর, ঘরটা কেমন?"

"সবই ভাল। শুধু..."

"কী শুধু?"

"দোতলা-তিনতলা হলে বেটার হত। ব্যালকনি পাওয়া যেত একখানা।"

"এই তো বিপদে ফেললি," পার্থ আঙুলে চুল পাকাচ্ছে, "দাঁড়া, রিসেপশনে একবার বলে দেখি। যদি পটিয়ে-পাটিয়ে ম্যানেজ করতে পারি... এক্সট্রা কিছু লাগে তো দিয়ে দেব।"

বলেই পার্থ দুম করে ধাঁ। ফিরল প্রায় মিনিট কুড়ি পর। চোখ-মুখে টগবগ করছে উত্তেজনা।

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "কী গো, ব্যবস্থা হল?"

"আজ নয়, কাল সকালে পেয়ে যাব। টপ ফ্লোরে। খুশি?"

"ভীষণ।"

"এবার তার চেয়েও বড় খবরটা দিই? শুনে তোর মাসি বুদ্ধিতে শান দিতে থাকুক?"

"কী খবর গো?"

লাগোয়া বাথরুম থেকে জল ছিটিয়ে এসে মুখ মুছছিল মিতিন। তোয়ালে কাঁধে ফেলে বলল, "সুজিত দত্ত এই হোটেলে উঠেছেন, তাই তো?"

"হ্যাঁ, এই মাত্র চেক ইন করলেন," বলতে বলতে পার্থ তোতলাচ্ছে, "তু-তু-তুমি কী করে জানলে?"

মিতিন হেসে বলল, "আমার ডিটেকটিভ এজেন্সির নাম কী মনে

আছে তো? থার্ড আই। তৃতীয় নয়ন। এটা আমার ওই তৃতীয় চক্ষুর নমুনা।"

টুপুর আর পার্থ চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। নাঃ, কারওরই মাথায় ঢুকছে না।

॥ ৪ ॥

সাড়ে ন'টা বাজে। বুমবুম এখনও ঘুমে কাদা। সে না জাগা পর্যন্ত বেড়াতে বেরনোর কোনও সুযোগই নেই। অগত্যা টুপুর আর মিতিন স্নান সেরে নিল একে-একে। রাতে প্লেনে কারওরই ঠিকঠাক ঘুম হয়নি, ফলে গা-টা ম্যাজম্যাজ করছিল। শাওয়ারের ঠান্ডা জলে বেশ তরতাজা হল শরীর। এবার পার্থ ঢুকেছে বাথরুমে।

সুজিত দত্তর কেসটা এখনও টুপুরের মাথায় চেপে আছে। চুলটুল আঁচড়ে, জিন্‌স, টি-শার্ট পরে ঘরের বাইরে একবার পাক খেয়ে এল টুপুর। টানা লম্বা প্যাসেজ একেবারে শুনশান, দু'ধারে সব ক'টা রুমেরই দরজা বন্ধ। উঁহু, বোঝার জো নেই সুজিত দত্ত ধারেকাছে আছে কিনা।

ঘুরে এসে টুপুর ফের মিতিনকে জিজ্ঞেস করল, "সুজিত দত্ত কি সত্যিই আমাদের ফলো করে এখানে এসে উঠল?"

সুটকেস খুলে বুমবুমের জামাপ্যান্ট বের করছিল মিতিন। হালকা গলায় বলল, "আমি তো কোনও কারণ দেখি না।"

"আমিও। ভদ্রলোক আমাদের অযথা ধাওয়া করবেনই বা কেন? এখানে ওঠা হয়তো নিছক কাকতলীয়।"

"সেরকমই কিছু ধরে নে। অনর্থক টেনশন করছিস কেন?"

মিতিন সুটকেসের ডালা বন্ধ করল, "শুধু একটা কথাই বলব, চোখ-কানটা খোলা রাখবি।"

সে তো টুপুর রাখবেই। কথা না বাড়িয়ে টুপুর টিভির রিমোটখানা হাতে তুলে নিল। বিছানায় বসে চ্যানেল ঘোরাচ্ছে। বেশিরভাগই স্থানীয় চ্যানেল। কোথাও সিঙ্গাপুরি মেয়েদের ফ্যাশন প্যারেড চলছে, তো কোথাও ইংরেজিতে নীরস বকরবকর। মালয়ী আর চিনা ভাষাতেও অনুষ্ঠান চলছে কোনও-কোনও চ্যানেলে। হঠাৎ একখানা ভারতীয় চ্যানেলও এসে গেল। খবর পড়ছেন এক মহিলা। মায়ানমার থেকে ভারতে বার্ড ফ্লু-র ভাইরাস ঢোকা বন্ধ করতে সতর্কবার্তা জারি করেছে মণিপুর সরকার ... শুটিংয়ের জন্য ঐশ্বর্য রাইয়ের সঙ্গে অভিষেক বচ্চনের বিয়ে পিছিয়ে গেল ... আগ্রায় গত কাল গ্রেপ্তার হয়েছে এক বিদেশি। ভারতীয় বিমানবাহিনীর সদর দপ্তরের সামনে ফোটো তোলার অপরাধে..."

শেষ খবরটা শুনেই টুপুর ঝট করে ঘাড় ঘোরাল, "লোকটা নিশ্চয়ই স্পাই। তাই না মিতিনমাসি?"

মিতিনও খবরটা শুনছিল। বলল, "হতেও পারে। তবে না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।"

"কেন? লোকটা তো ক্যামেরা সমেত হাতেনাতে পাকড়াও হয়েছে!"

"দুর, গুপ্তচররা কি অত বোকা হয় নাকি? সবাইকে দেখিয়ে-দেখিয়ে শাটার মারবে? তা ছাড়া আজকাল আর স্পাইদের দিয়ে ফোটো তোলানোর দরকার হয় না। এখন আকাশে ছেড়ে রাখা উপগ্রহের কল্যাণে মিলিটারিদের প্রায় প্রতিটি খুঁটিনাটি খবরই জোগাড় করে ফেলা যায়। কোথায় কোন যুদ্ধজাহাজ ঘুরছে, কোন এয়ারবেসে ক'টা যুদ্ধবিমান রাখা আছে, অবিরাম তার ফোটো তুলছে স্যাটেলাইটের ক্যামেরা। আর সেই ক্যামেরা এত শক্তিশালী

যে, যুদ্ধজাহাজের স্ক্রুগুলো পর্যন্ত তার নজর এড়ায় না।"

"ও। তার মানে এখন উপগ্রহগুলোই স্পাই? মানুষ-গুপ্তচরের দিন শেষ?"

"পুরোপুরি নয়, তাদেরও কাজ আছে। কোথায় কোন ফ্রন্টে কত মিলিটারি পাঠানো হবে, কবে কখন কোন ব্যাটেলিয়ান কোথায় সরবে, কিংবা কোনও দেশ অন্য দেশকে আক্রমণ করার মতলব ভাঁজছে কিনা... এ সব খবর তো মানুষকেই জোগাড় করতে হয়।"

"কীভাবে পায় খবরগুলো?"

"হাজারও উপায় আছে। গুপ্ত ক্যামেরা বা মাইক্রোফোন বসানো থাকে কোথাও-কোথাও। সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও গোপন খবর পাচার করার লোক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়," মিতিন মুচকি হাসল, "জানিস তো, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের যিনি দু' নম্বর বড়কর্তা ছিলেন, সেই কিম ফিলবি কিন্তু আদতে ছিলেন এক রাশিয়ান গুপ্তচর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি কত খবর যে রাশিয়াকে সাপ্লাই করে গিয়েছেন..."

"বলো কী? কেউ ধরতে পারেনি?"

"ওস্তাদ স্পাইদের ধরে ফেলা খুব সহজ কাজ নয় রে। তারা খবর পাচারের নিত্যনতুন টেকনিক বের করে। হয়তো সকলের চোখের সামনে দিয়েই খবর পাঠিয়ে দেবে, কিন্তু কায়দার গুণে কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পাবে না। কত ধরনের সাংকেতিক ব্যাপারস্যাপার যে থাকে, তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই।"

মাসি-বোনঝির বাক্যালাপের মাঝেই বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছিল পার্থ। দাড়িটাড়ি কামিয়ে। স্নানটান সেরে। আচমকা সেও নাক গলাল আলোচনায়। বিজ্ঞের সুরে বলল, "ক্লস ফুকসের নাম শুনেছিস, টুপুর? বিখ্যাত বিজ্ঞানী। আবার গুপ্তচরও বটে। তিনি তো অ্যাটম বোমের আস্ত ফর্মুলাটাই আমেরিকা থেকে রাশিয়ায় চালান

করে দিয়েছিলেন। কীভাবে করেছিলেন জানিস?"

"সে গপ্পো পরে হবে," মিতিন বাধা দিল, "এখন ছোটসাহেবকে তোলো। সারা সকাল ঘরেই কাটাব নাকি, অ্যাঁ?"

বলার সঙ্গে-সঙ্গে পটাং চোখ খুলে গিয়েছে বুমবুমের। ফিক করে হেসে বলল, "আমি তো জেগেই আছি।"

"তা হলে এবার দয়া করে গাত্রোত্থান করো। দশ মিনিটের মধ্যে রেডি না হলে তোমাকে রেখেই কিন্তু আমরা বেরিয়ে যাব।"

"আর ফাইভ মিনিট্স বেশি দাও মা, প্লিজ।"

পনেরো মিনিট নয়, বুমবুমের তৈরি হতে সময় লাগল পাক্কা পঁচিশ মিনিট। তার মধ্যে অবশ্য পার্থ টুকটাক কিছু কাজ সেরে নিল। হ্যান্ডিক্যামে নতুন ক্যাসেট ভরা, ব্যাটারিতে চার্জ দেওয়া। চাংগি এয়ারপোর্টের টুরিস্ট কাউন্টার থেকে সিঙ্গাপুরের দর্শনীয় স্থান সংক্রান্ত বেশ কিছু লিফলেট জোগাড় করেছিল, সেগুলোও পুরল পকেটে। ব্যস, এবার বেরিয়ে পড়লেই হয়।

রুমে চাবি লাগিয়ে ডাইনিং হলে এল সকলে। সামনের টেবিলটাতেই বসেছে। মেনুকার্ড দেখতে-দেখতে পার্থ জিজ্ঞেস করল, "কী রে টুপুর, কী খাবি?"

টুপুর কাঁধ ঝাঁকাল, "এনিথিং।"

"হেভি? না লাইট?"

মিতিন বলল, "প্লেনে অনেক রাত্তিরে ডিনার হয়েছে, এখন হালকাই ভাল।"

"তাই হোক তবে," পার্থ মুখভঙ্গি করল, "সেই সঙ্গে লাঞ্চ, ব্রেকফাস্ট, ডিনারের ব্যাপারে একটা প্রিন্সিপলও তৈরি হয়ে যাক। এখন থেকে খাওয়ার ব্যাপারে কোনও বাঁধাধরা টাইম থাকবে না। যখনই জাগিবে জঠর, তখনই আহার।"

মিতিন হেসে বলল, "জঠর নয়, বলো তোমার রসনা।"

"বটেই তো। রসনাকে তো তৃপ্ত করতেই হবে। মালয়েশিয়ান খাবার খাব, ইন্দোনেশিয়ান চাখব, থাই ফুড, চাইনিজ কোরিয়ানও টেস্ট করতে পারি..."

"সব হবে। তবে এখন সাহেবি ব্রেকফাস্টটাই বলো।"

সেই মতোই অর্ডার দেওয়া হল। বাটার টোস্ট, টার্কি সসেজ, স্ক্র্যাম্বল্‌ড এগ আর কফি। বুমবুমের জন্য মিল্কশেকও বলা হল এক গ্লাস।

বিলিতি নাস্তা টেবিলে পৌঁছনোর আগেই ছোট্ট ঝটকা। সুজিত দত্ত ঢুকছেন ডাইনিং হলে। পার্থদের দেখে পলকের জন্য থমকালেন যেন। পরক্ষণে নিজেই এগিয়ে এসেছেন। হাসি-হাসি মুখে বললেন, "সাহেব দেখছি ক্যামেরা কাঁধে রেডি। তা চললেন কোথায়?"

মিতিনকে এক ঝলক দেখে নিয়ে পার্থ বলল, "এখনও ডিসাইড করিনি। শুনেছি এখানে সেন্টোসা আইল্যান্ড খুব বিখ্যাত?"

"অবশ্যই। পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা ছোট্ট একটা দ্বীপকে কত সুন্দর করে তোলা যায়, সেন্টোসা তার জ্বলন্ত উদাহরণ। ওখানকার আন্ডার ওয়াটার অ্যাকোয়ারিয়াম তো রীতিমতো তাকলাগানো। এ ছাড়া আমার সাজেশন, জুরং বার্ড পার্কেও একবার যাবেন। ওটা না দেখলে সিঙ্গাপুর আসাই বৃথা।"

"দর্শনীয় জায়গার লিস্টে তো বোটানিক্যাল গার্ডেন আর চিড়িয়াখানার নামও দেখছিলাম।"

"হ্যাঁ। ওগুলোও দ্রষ্টব্য। চিড়িয়াখানায় নাইট সাফারি তো দারুণ ইন্টারেস্টিং," সুজিত দত্ত একগাল হাসলেন, "আসলে ব্যাপারটা কী জানেন? সিঙ্গাপুর সরকার পর্যটন ব্যাবসাটা খুব ভাল বোঝে। অতি সাধারণ কিছুকেও এমন মনোহারী মোড়কে আপনার সামনে পেশ করবে, আপনি চোখ ফেরাতে পারবেন না। সন্ধেবেলা সিটি সেন্টারের দিকে যান, সিঙ্গাপুর নদীর ধারে বসে থাকলেই আপনার

প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। চারদিকে আলো দিয়ে, ফোয়ারাটোয়ারা বসিয়ে জায়গাটা এমন ভাবে সাজিয়ে রেখেছে! ওদিকে নদীতেও নৌকোবিহারের এলাহি আয়োজন... অথচ লোকে বলে, ওটা নাকি আদতে নদীই নয়। সমুদ্র থেকে ঢুকে আসা আঁকাবাঁকা খাঁড়ি।"

"বুঝেছি। বাছাবাছির দরকার নেই। সিঙ্গাপুরে যা দেখব, তাই ভাল লাগবে।"

"ঠিক। একদম ঠিক। এখানকার জমকালো শপিং মলগুলোও দেখতে ভুলবেন না। চৌষট্টি তলা একটা বাড়ি জুড়ে শুধুই ঝলমলে দোকানপাট, ভাবতে পারেন? আর হ্যাঁ, পারলে পুরনো শহরটাকেও একবার দেখে আসবেন। সেই ব্রিটিশ আমলের ঘরবাড়ি, চার্চ ... সেই র‍্যাফ্‌লসাহেব যেভাবে সিঙ্গাপুর শহরটার পত্তন করেছিলেন..."

একটানা বকেই চলেছেন সুজিত দত্ত। এয়ারপোর্টে যে মানুষটা ফিরেও তাকালেন না, তিনি হঠাৎ আবার ওপরপড়া হয়ে এত কথা বলছেনই বা কেন? বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য আছে কি? টুপুরের কেমন যেন সন্দেহজনক ঠেকছিল। মিতিনমাসিই বা এমন মুগ্ধ শ্রোতা কেন হয়ে গেল হঠাৎ? জরিপ করতে চাইছে সুজিত দত্তকে?

টেবিলে খাবার এসে গিয়েছে। সুজিত দত্ত বোধ হয় সরেই যাচ্ছিলেন এবার, কিন্তু টুপুরকে অবাক করে দিয়ে মিতিনই সহসা বলে উঠল, "বসুন না মিস্টার দত্ত। আমাদের সঙ্গেই ব্রেকফাস্ট করুন।"

"থ্যাঙ্কস। আমার ব্রেকফাস্ট হয়ে গিয়েছে।"

"তা হলে এক কাপ কফিই চলুক। আমরা কফি খেতে-খেতে গল্প করি।"

এবার আর সেভাবে না করলেন না সুজিত দত্ত। চেয়ার টেনে বসেছেন। ফিলিপিনো বেয়ারাটিকে ডেকে আর-এক কাপ কফির অর্ডার দিল মিতিন। সহজ সুরে বলল, "সিঙ্গাপুর শহরটাকে আপনি দেখছি খুবই ভাল চেনেন?"

মৃদু হেসে সুজিত দত্ত বললেন, "বহুবার এসেছি তো, চষা হয়ে গিয়েছে।"

"তা হলে আপনিও আজ আমাদের সঙ্গে চলুন না! একসঙ্গে সেন্টোসা ঘুরে আসি।"

এবার বুঝি একটু থতমত খেলেন সুজিত দত্ত। একটুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, "বেড়ানোর আমার উপায় নেই, ম্যাডাম। একটা বিজ়নেস অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, এখনই বেরোতে হবে।"

"ও। তা সেন্টোসা আমরা যাব কী করে যদি একটু বলে দেন..."

"ট্যাক্সি ধরে নিন। সেন্টোসার ভিতরে গিয়েও গাড়ি ছাড়তে পারেন। আবার রোপওয়ে স্টেশনেও নামতে পারেন। রোপওয়েতে চড়ে সেন্টোসা যাওয়াটা বেশ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। কেব্‌লকারগুলো যায় অনেক উঁচু দিয়ে। নীচে সমুদ্রের খাঁড়ি, সিঙ্গাপুরের কেপেল ডক, বিউটিফুল দৃশ্য।"

পার্থ ফস করে বলে উঠল, "কেবল্‌কারগুলো মাউন্ট ফেবার থেকে ছাড়ে না?"

"মাউন্ট না আরও কিছু!" সুজিতের গলায় শ্লেষ, "এখানে ছোট-ছোট টিলাগুলোও সব মাউন্টেন! আমার কাছে জেনে রাখুন মশাই, এই শহরের চৌহদ্দির মধ্যে ৫০০ ফিটের বেশি উঁচু কোনও পাহাড় নেই। সিঙ্গাপুরের বহু বাড়ি ওই পাহাড়গুলোর চেয়ে উঁচু।"

"অর্থাৎ মাউন্ট বলাটাও সিঙ্গাপুর সরকারের প্যাকেজিংয়ের মধ্যে পড়ে?" পার্থ ফিক করে হাসল।

"সম্ভবত," বড়-বড় চুমুকে কফির কাপ শেষ করলেন সুজিত দত্ত। ঘড়ি দেখছেন। চোখ তুলে বললেন, "আজ তবে সেন্টোসাটাই ঘুরে আসুন। পরে আপনাদের অভিজ্ঞতার কথা শোনা যাবে। আপনাদের রুম নম্বর যেন কত?"

"১০৪।"

"আমি আছি ২১৭-এ। আসি তা হলে?"

একটু যেন বেশি তাড়াহুড়ো করেই উঠে গেলেন সুজিত দত্ত। ভদ্রলোক দৃষ্টির আড়াল হতেই পার্থ বলে উঠল, "তোর মাসির তো এখন মুশকিল হয়ে গেল রে টুপুর।"

"কেন?"

"সুজিত দত্তকে সন্দেহ করার আর তো কোনও উপায় রইল না রে। যে লোকটা যেচে এসে এত আড্ডা দিয়ে গেল, তাকে কি খুব পাজি বলে মনে হয়?"

টুপুর বলল, "খারাপ ভাল জানি না। তবে ভদ্রলোক কিন্তু বেশ অদ্ভুত রকমের। আমার তো ধারণা, কায়দা করে উনি জেনে গেলেন আমরা কোথায় যাচ্ছি।"

"বলছিস? পার্থ চোখ পিটপিট করল, "আমরা কি তা হলে ডেস্টিনেশন বদলে ফেলব?"

বুমবুমের মিল্কশেক শেষ। চেটোর উলটো পিঠে ঠোঁট মুছতে-মুছতে সে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভাল। চলো আমরা বার্ড পার্ক যাই কিংবা চিড়িয়াখানায়।"

"উঁহু, ওসব কাল হবে," শেষ সসেজটা মুখে পুরল মিতিন। মাথা দুলিয়ে বলল, "আজ এ বেলা সেন্টোসা।"

॥ ৫ ॥

সকালে দিব্যি ঝকঝকে ছিল দিনটা। টুপুররা যখন হোটেল থেকে বেরোল, লিট্‌ল ইন্ডিয়ার রাস্তায় তখনও ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর। অথচ ট্যাক্সি যেই না ব্রিজ পেরিয়ে সেন্টোসা দ্বীপে ঢুকেছে, অমনই ঝুপঝুপ বৃষ্টি। একটানা নয়, এই ঝরছে, এই থামছে। বৃষ্টি হয়ে গরম কিন্তু কমার

লক্ষণ নেই। বরং বিশ্রী এক আর্দ্রতায় চিটপিট করছে গা-হাত-পা। সিঙ্গাপুর নিরক্ষরেখার খুব কাছে বলেই নাকি এখানকার আবহাওয়া এরকম বিটকেল। এখানে নাকি তিনটে ঋতু। গরম, আরও গরম, আরও আরও গরম। সঙ্গে যখন-তখন বারিধারা। বারো মাস। শীত শব্দটার নাকি অস্তিত্বই নেই সিঙ্গাপুরে।

তা বৃষ্টি হোক, কি রোদ্দুর, টুপুরদের বেড়ানোর উৎসাহে কিন্তু ভাটা পড়েনি। গাছপালায় ছাওয়া সবুজ দ্বীপটায় পা রাখার পর থেকেই চলছে ছোটাছুটি। লাল-নীল-হলুদ-সবুজ দাগটানা দেখনবাহার বাস ঘুরপাক খাচ্ছে দ্বীপময়, টিকিট-ফিকিটের বালাই নেই, চেপে বসলেই হল। তারপর পছন্দমতো জায়গায় নেমে, খানিক ঘুরেফিরে, আবার ওঠো আর-এক বাসে। চলো, যেখানে প্রাণ চায়। চারদিক খোলা ছোট-ছোট ট্রামও চলছে দিব্যি। তাতে চড়ে ঘোরার মজাও নেহাত কম নয়।

প্রথমে যাওয়া হল আন্ডারওয়াটার ওয়ার্ল্ডে। সমুদ্রের তলার দুনিয়াটা কী নিপুণ দক্ষতায় প্রকাণ্ড এক অ্যাকোয়ারিয়ামে বন্দি। চলন্ত পাটাতনে দাঁড়িয়ে অ্যাকোয়ারিয়াম পরিক্রমা করতে-করতে টুপুরের তো মনে হচ্ছিল তারা যেন সত্যি-সত্যি সমুদ্রের নীচে চলে গিয়েছে। পথের দু' ধারে, মাথার উপর, অজস্র সামুদ্রিক প্রাণী। নানান জাতের নাম না জানা মাছ, শুঁড় কিলবিল অক্টোপাস, স্কুয়িড, কাঁকড়া, স্টারফিশ, জেলিফিশ, ঈল...ভয়ংকর চেহারার হাঙরও রয়েছে অনেক। কী শীতল তাদের দৃষ্টি, দেখলেই গা ছমছম করে। মাথায় লম্বা বেয়নেট নিয়ে একটা বিশাল মাছ সাঁইসাঁই ধেয়ে এল বুমবুমের দিকে। মোটা কাচের এপারে দাঁড়িয়েও ভয়ে কেঁপে উঠল বুমবুম।

পার্থ মন দিয়ে হ্যান্ডিক্যামে ছবি তুলছিল। খোলা মনিটরে চোখ রেখে বলল, "মাছটাকে চিনে রাখ টুপুর। এ হচ্ছে স্টিং রে। ওই শক্ত

হুল পেটে ঢুকিয়ে ওরা মানুষের নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত বের করে আনে।"

টুপুর বলল, "কিছুদিন আগে এই স্টিং রে-র আক্রমণেই স্টিভ আরউইন মারা গেলেন না?"

"হ্যাঁ, কী মর্মান্তিক মৃত্যু! হাঙর, কুমির কত কী নিয়ে উনি খেলা করেছেন, কিন্তু স্টিং রে-র কাছে হেরে গেলেন। আর ওই ঝাঁকটা দ্যাখ। ওগুলো হল পিরান্‌হা। ওদের মতো নিষ্ঠুর প্রাণী বোধ হয় আর দুটো নেই। দল বেঁধে যখন অ্যাটাক করে, তিমিমাছও রক্ষা পায় না।"

বুমবুম বলল, "আমি পিরান্‌হা দেখেছি। অ্যানিম্যাল প্ল্যানেটে। শার্কও।"

পার্থ হেসে বলল, "হাঙর দেখার জন্য অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট খোলার কী দরকার। তোকে একদিন মাছের বাজারে নিয়ে যাব। দেখবি, ঢেলে হাঙর বিক্রি হচ্ছে।"

বুমবুম অবাক মুখে বলল, "সত্যি?"

"একটা নয়, তিনটে সত্যি। আজকাল বেশিরভাগ বিয়েবাড়িতে তো হাঙরেরই ফিশফ্রাই খাওয়ায়। একটু আঁশটে-আঁশটে গন্ধ থাকে, তবে টেস্ট মন্দ নয়।"

মজা করতে-করতেই মাটির নীচ থেকে বেরিয়ে এল সকলে। বাইরে এসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল টুপুর। ইস, আন্ডারওয়াটার ওয়ার্ল্ডে তিমিমাছটা থাকলেই ষোলো কলা পূর্ণ হত।

এর পর সিলোসো বিচ। ঢেউবিহীন সমুদ্রের ধারে ঝলমলে বালুকাবেলা। বেড়াতে আসা লোকজন মহা আনন্দে ভলিবল খেলছে। কেউ বা মেতেছে জলক্রীড়ায়। জোরকদমে স্কিয়িং চলছে। ওয়াটার স্কুটারও। বিচে হোটেল রেস্টুরেন্টও আছে খানকতক, সেখানেও জমজমাট ভিড়।

সুখাদ্যের গন্ধ পেয়েই পার্থর পেট চুঁইচুঁই। এক ইতালিয়ান

রেস্তরাঁয় ঢুকে আস্ত একখানা পিৎজা সাঁটিয়ে ফেলল বাপ-ছেলে। টুপুর মিতিনমাসির দলে, তারা খেল পাস্তা।

খেতে-খেতে টুপুর জিজ্ঞেস করল, "এই সমুদ্রটার নাম কী গো, মিতিনমাসি?"

"সিঙ্গাপুর প্রণালী। দক্ষিণ চিন সাগর আর জাভা উপসাগরকে জয়েন করেছে এই স্ট্রেট অফ সিঙ্গাপুর।"

"ও। সমুদ্র নয় বলেই বুঝি ঢেউ কম?"

"হুঁ। কিন্তু যথেষ্ট গভীর। সেই জন্যই তো এখানে এত বড় বন্দর গড়ে উঠেছে।"

পার্থ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "গড়ে উঠেছে নয়, বলো, গড়ে তোলা হয়েছে। দুশো বছর আগেও সিঙ্গাপুরে কিস্‌সু ছিল না। এখানে থাকত মাত্র হাজারখানেক লোক। বেশিরভাগই মালয়ী। ভারতে আসা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মালয়ের সুলতান হুসেন শা'র সঙ্গে চুক্তি করে সিঙ্গাপুরের দখল পায়। এখান থেকে জাভা, বোর্নিও, সুমাত্রা, চিন, থাইল্যান্ড, সর্বত্র যাওয়ার সুবিধে আছে বলে ব্রিটিশরা এখানেই বন্দর বানায়। বন্দরটাকে রক্ষা করার জন্য একটা দুর্গও বানিয়েছিল। ফোর্ট সিলোসো। এখানেই আছে দুর্গটা। ওওওই টঙে! যাবে দেখতে?"

টিলায় উঠে ফোর্ট সিলোসো দেখার ব্যাপারে কারওরই বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল না। একে ফের ঝিরঝির বৃষ্টি নেমেছে, তার উপর গত বছর মহারাষ্ট্রে এককাঁড়ি দুর্গ দেখে-দেখে চোখ হেজে গিয়েছে। অতএব এককথায় প্রস্তাব বাতিল। তার চেয়ে বরং আবার একখানা বাস ধরে মেরলিয়ন চলে যাওয়াই ভাল।

মেরলিয়ন এক বিশাল উঁচু মূর্তি। নীচের দিকটা তার জলকন্যার মতো, মুখ সিংহের। এই মূর্তি সিঙ্গাপুরের প্রতীকও বটে। মূর্তির পেটের ভিতর লিফ্‌ট চলছে। লিফ্‌টে চড়ে সিংহের মুখ পর্যন্ত চলে

গেল টুপুররা। ন' তলায় ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে, থুড়ি সিংহের মুখগহ্বরে দাঁড়িয়ে, গোটা সেন্টোসা দ্বীপটাকে দেখল ভাল করে। দূরে, সিঙ্গাপুরের আকাশছোঁয়া বাড়িগুলোও চোখে পড়ল আবছা-আবছা।

নেমে ফের ব্লু লাইন বাস। সোজা ডলফিন লেগুন। সেখানে তখন শুরু হচ্ছে বৈকালিক ডলফিন শো। টিকিট আগেই কাটা ছিল, সুশৃঙ্খল লাইন দিয়ে একে-একে ঢুকে পড়ল সকলে। ভিতরে বেজায় ভিড়। নীল জলের হ্রদখানা ঘিরে সারি দিয়ে পাতা চেয়ারগুলো ভর্তি, দাঁড়িয়ে আছে থরে-থরে মানুষ। ঠেলেঠুলে সামনে গেল টুপুর বুমবুমের হাত ধরে।

মিনিটপাঁচেকের মধ্যেই শুরু হল খেলা। বাজনার তালে-তালে হ্রদের জলে নাচছে দুটো ডলফিন। তড়াং-তড়াং লাফাচ্ছে, ট্রেনারের নির্দেশে রিংয়ের ভিতর দিয়ে গলে যাচ্ছে অবলীলায়। একজোড়া উদবিড়ালও খেলা দেখাল ডাঙায়। দর্শকদের শেখাল, কীভাবে প্লাস্টিকের খালি বোতল আর এঁটো কাগজের কাপপ্লেট যত্রতত্র না ছড়িয়ে ডাস্টবিনে ফেলতে হয়। বুমবুম তো দেখে মহা খুশি। দর্শকদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চটাস চটাস তালি বাজাচ্ছে।

শো যখন ভাঙল, বিকেল প্রায় শেষ। ঘেরা জায়গাটা থেকে বেরিয়ে টুপুররা এসে বসল পাশের পালাওয়ান বিচে। এখানে সমুদ্রতট অনেকটাই চওড়া। ছোট-ছোট ঢেউ পারে পৌঁছে ভাঙছে ছলাৎ-ছলাৎ। এই বিকেলেও স্নান করতে সমুদ্রে নেমেছে এক দল চিনা ছেলেমেয়ে, উল্লসিত হয়ে এ ওর গায়ে জল ছিটোচ্ছে। অদূরে এক সেতু দেখা যায়। পর্যটকরা অনেকেই সেতু পার হয়ে চলেছে আর-একটা ছোট্ট দ্বীপে।

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "ওই দ্বীপটায় কী আছে গো?"

পার্থ লিফলেট খুলে জায়গাটা সম্পর্কে পড়ে নিচ্ছিল। ঝট করে চোখ তুলে বলল, "ওই ছোট্ট দ্বীপটা হচ্ছে এশিয়ার দক্ষিণতম বিন্দু।"

মিতিন মুখ কুঁচকে বলল, "তা কী করে হয়? সিঙ্গাপুরের নীচে তো জাভা সুমাত্রা আছে, বোর্নিও আছে..."

"আহাহা, ওগুলো তো আলাদা-আলাদা দ্বীপ। আসলে এশিয়া মহাদেশের স্থলভূমি এখানকার এই দ্বীপটাতেই শেষ হয়েছে। দ্যাখো না, লেখাটা পড়ো।"

পড়ল মিতিন, তবে খুব একটা অভিভূত হল না। বলল, "যাও, তোমরা ঘুরে এসো। আমি এখানেই আছি।"

বুমবুম বলল, "আমিও যাব না। টায়ার্ড লাগছে।"

শেষ পর্যন্ত যাওয়াই হল না। প্রত্যেকেই খুব ক্লান্ত, এবার মানে-মানে হোটেলে ফিরতে চায়। ত্যানজং বিচ, প্রজাপতি উদ্যান, মশলার বাগান, মিউজ়িক্যাল ফাউন্টেন সবই বাকি রয়ে গেল। যাক গে, কাল প্রায় সারা রাত জেগে আজই কি এত ধকল নেওয়া সম্ভব?

ট্যাক্সি ছেড়ে হোটেলের লাউঞ্জে ঢুকতে না-ঢুকতেই সামনে নারায়ণ। টুপুরদের দেখেই হাঁকপাঁক করে দৌড়ে এসেছেন ভদ্রলোক। হাত কচলে পার্থকে বললেন, "একটা সমস্যা হয়েছে স্যার।"

পার্থ হতভম্ব মুখে বলল, "কী সমস্যা?"

"আপনি পেঙ্গুইন ইন্টারন্যাশনালের যে চিঠিটা আমায় দিয়েছিলেন, সেটা তো আসল নয়।"

"মানে?"

"ওটা ডুপ্লিকেট স্যার। অরিজিনালটা বোধ হয় আপনার কাছে রয়ে গিয়েছে।"

"তাই কি?"

"হ্যাঁ স্যার। আমাদের অফিসে অরিজিনালটা দিতে হয়।"

"ওহো, ওটা তা হলে বোধ হয় সুটকেসে। গোছগাছের সময় ভুল

করে ঢুকিয়ে ফেলেছি। আর আপনার কাছে স্ক্যান করা কপিটা চলে গিয়েছে। পার্থ দু'-এক সেকেন্ড ভাবল কী যেন। তারপর বলল, "কিন্তু এতে অসুবিধের কী আছে? স্ক্যান করা কপি তো আসলেরই সমতুল।"

"জানি স্যার। তবে আমাদের অরিজিনালটাই দরকার।"

"ঠিক আছে, রুমে গিয়ে খুঁজে দেখছি।"

"আমি কি এখানে অপেক্ষা করব?"

"না না, আপনি কেন মিছিমিছি... পেলে ফোন করে দেব। সকালে এসে নিয়ে যাবেন।"

"এখনই পেলে ভাল হত স্যার।"

"সারাদিন ঘুরে এইমাত্র ফিরলাম... বড্ড টায়ার্ড। কালই আসুন, প্লিজ়।"

"কাল কখন আসব? আপনারা তো নিশ্চয়ই সকালে আবার বেরোবেন..."

"বলছি তো, বেরনোর আগে পেয়ে যাবেন। রাতে আপনাকে ফোন করে দেব।"

"অরিজিনালটা না পেলে কিন্তু প্রবলেম হয়ে যাবে স্যার।"

"কীসের প্রবলেম?" এতক্ষণে পার্থর ভুরুতে ভাঁজ, "আপনাদের কি সন্দেহ, আমরা আসল লোক নই?"

"ছি ছি স্যার, এ কথা কখন বললাম?" নারায়ণ জিভ কাটলেন, "আমাদের অফিসে অরিজিনালটাই জমা দেওয়ার নিয়ম। তাই আপনাদের..."

"বোর করছেন। তাই তো?" পার্থ এবার একটু তেরিয়া হয়েছে, "ধরুন, আসল চিঠিটা সঙ্গে আনতে ভুলে গিয়েছি। যদিও তার আশঙ্কা কম। আমার ধারণা, ব্যাগ সুটকেসেই কোথাও আছে। তবু যদি খুঁজে দিতে না পারি, আপনার অফিস কী করবে? আমাদের

তাড়িয়ে দেবে? হোটেলের বিল মেটাবে না?"

"সে তো অনেক কিছুই করতে পারে। আপনাদের ফেরার টিকিট ক্যানসেল করাও তো খুব কঠিন কাজ নয়," পলকের জন্য নারায়ণের চোয়াল যেন একটু শক্ত হল। পরক্ষণে গলায় মোলায়েম সুর, "কিন্তু পেঙ্গুইন রিসর্ট্স ইন্টারন্যাশনাল অতিথিদের সম্মান করে। আমাদের একটা গুডউইল আছে। আশা করব, আমাদের মাননীয় অতিথিরাও সেই গুডউইলটা বজায় রাখতে সাহায্য করবেন।"

"ঠিক আছে," পার্থ আরও গম্ভীর, "আমি এখনই খুঁজে দেখছি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। আমি আপনার ফোনের প্রতীক্ষায় রইলাম।"

রুমে ফিরেই ঝপাঝপ ব্যাগ সুটকেস টেনে নামাল পার্থ। শুরু হয়ে গিয়েছে অনুসন্ধান পর্ব। প্রথমে ব্যাগ সুটকেসের পকেটগুলো হাতড়াল। নেই। একটা একটা করে জামাকাপড় বের করে রাখছে বিছানায়। আঙুল চালিয়ে দেখছে চিঠিটা কোনও ভাঁজে ঢুকে আছে কিনা।

পার্থর কাণ্ডকারখানা দেখছিল মিতিন। নারায়ণের সঙ্গে কথোপকথনের সময় সে টুঁ শব্দটি করেনি। ঘরে এসেও চুপচাপ ছিল। জামাকাপড় ঘাঁটাঘাঁটি দেখে মুখ খুলেছে। চোখ পাকিয়ে বলল, "করছটা কী, অ্যাঁ? সুটকেসটা কী সুন্দর গোছগাছ করে এনেছিলাম, পুরো ছত্রখান করে দিলে তো?"

"নিকুচি করেছে গোছানোর," পার্থ গজগজ করে উঠল, "ওই চিঠি না পেলে কী হবে ভেবে দেখেছ?"

"কী হবে? হবেটা কী?"

"সাড়ে সব্বোনাশ। শুনলে না, লোকটা কেমন মিষ্টি করে ভয় দেখিয়ে গেল? সত্যি যদি প্লেনের টিকিট ক্যানসেল করে দেয়?"

"ইল্লি রে," টুপুর ফোঁস করে উঠল, "টিকিট তো তোমার কাছে।"

"তাতে কী? টিকিটের নম্বর নিশ্চয়ই পেঙ্গুইনের কাছে আছে। ইন্টারনেট থেকে যদি বাতিল করে দেয়, এয়ারপোর্টে আমাদের কী ঝামেলায় পড়তে হবে বুঝতে পারছিস?"

"মনে হয় না অতটা করবে," মিতিন মাথা দোলাল, "আর তেমন কিছু যদি ঘটেও, আমাদের তো ক্রেডিট কার্ড আছে। দরকার হলে থাকার মেয়াদ এক-দু' দিন বাড়িয়ে আমরাই টিকিট কেটে ফিরব।

"হোটেলের বিলও তো গুনতে হবে।"

"হলে হবে। এত নার্ভাস হচ্ছ কেন?" মিতিনের কোনও কিছুতেই হেলদোল নেই। উলটে ঠোঁটে এক মুচকি হাসি ঝুলছে, "তোমাকে একটা ব্যাপারে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি। চিঠিটা তুমি ব্যাগ কিংবা সুটকেসে ঢোকাওনি।"

"তা হলে?" পার্থ ঢোক গিলল, "তা হলে কি কলকাতাতেই ফেলে এলাম?"

"হতে পারে। তুমি যা কেয়ারলেস!"

পার্থ গুম হয়ে গেল। সুটকেস ফেলে উঠে দাঁড়াল। অস্থিরভাবে পায়চারি করছে ঘরে। হঠাৎ স্ট্যাচু হয়ে বলল, "নারায়ণকে তা হলে কী জবাব দেব?"

"কিচ্ছু বলতে হবে না। স্রেফ চেপে যাও।"

"কিন্তু কাল তো আবার হানা দেবে!"

"তখন আমি ফেস করব। বুঝিয়ে দেব, বেড়ানোর সুযোগ দিয়ে ওরা আমাদের মাথা কিনে নেয়নি।"

এতক্ষণে পার্থর মুখে হাসি দেখা দিয়েছে। তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, "বটেই তো। ফালতু-ফালতু লোকটাকে বেশি পাত্তা দিচ্ছিলাম।"

"লোকটা কিন্তু বেশ ট্যাঁটা আছে।" টুপুর না বলে পারল না, "সকালে দেখে একদম বোঝা যায়নি।"

"ট্যাঁটা তো ট্যাঁটা," মিতিন বুড়ো আঙুল দেখাল, "তাতে আমাদের ঘেঁচু। যা যা, আর-এক দফা স্নান সেরে ফ্রেশ হয়ে নে। একটু জিরিয়ে আবার বেরোতে হবে তো, নাকি?

॥ ৬ ॥

প্ল্যান তো অনেকই ছিল। তবে রাতের সিঙ্গাপুরদর্শন যেন জমল না সেভাবে। গায়ে জল ঢালার পরই বুমবুমের এমন তেড়ে ঘুম এল, কোনওক্রমে এক গ্লাস দুধ খেয়ে সে ঢলে পড়ল বিছানায়। শত ঠেলাঠেলিতেও চোখ খুলল না। অগত্যা কাউকে না কাউকে তো হোটেলে থাকতেই হয়। পার্থ আয়েশি মানুষ, হুড়ুদ্দুম ছোটাছুটি তার বেশিক্ষণ পোষায় না। মাসি বোনঝিকে বেরোতে বলে সে রয়ে গেল হোটেলে। তা বেড়াতে এসে দলের অর্ধেক লোকই যদি সঙ্গে না থাকে, ভ্রমণটা কেমন ছানা কেটে যায় না?

তবু মিতিনমাসির সঙ্গে শহরের অনেকটাই ঘুরল টুপুর। আলোয়-আলোয় দারুণ সেজে আছে রাতের সিঙ্গাপুর। উঁচু-উঁচু বাড়িগুলো থেকে দ্যুতি ঠিকরোচ্ছে যেন। পার্কের উজ্জ্বল আলো, দোকানপাটের আলো, ব্রিজের আলো, বিজ্ঞাপনের আলো, বাহারি পথবাতির আলো... এত আলোর ঝলকানিতে কেমন যেন দিশেহারা লাগে।

মাসি বোনঝি প্রথমে গেল শহরের দক্ষিণে। সিঙ্গাপুর নদীর দিকটায়। নদীর পারে মেরলিয়ন পার্কে বসে রইল একটুক্ষণ।

এখানেও মেরলিয়নের মূর্তি আছে একখানা। ছোটখাটো। মুখ দিয়ে ফোয়ারার মতো জল বেরোচ্ছে। এই নদীর ধারেই নাকি দুশো বছর আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির র‍্যাফল সাহেব পত্তন করেছিলেন শহরটার। এখন এ জায়গা সিঙ্গাপুরের ডালহৌসি পাড়া। এসপ্ল্যানেডও বটে। কাছেই পাঁচ-পাঁচখানা গগনচুম্বী অট্টালিকা নিয়ে সানটেক সিটি। অফিসের আড়ত। সেদিকে যাব-যাব করেও যাওয়া হল না শেষ পর্যন্ত। লম্বা ব্রিজ পেরিয়ে উলটো দিকের ভিক্টোরিয়া কনসার্ট হলে এল মিতিন আর টুপুর। সেখানে সবুজ লনে উদ্দাম নাচগানের আসর বসেছে। দু'-পাঁচ মিনিট বাজনার ঝংকার শুনেই টুপুরের মাথা ঝিমঝিম। কনসার্ট হলের সামনে থেকে ফের ট্যাক্সি। রংচঙে চায়না টাউনে চরকি মেরে সোজা অর্চাড রোডে। এ পাড়াটা যেন আরও ঝলমলে। রয়েছে নানান দেশের দূতাবাস, চক্ষু চড়কগাছ করে দেওয়া পেল্লায় সব জমকালো দোকান। গাছে ছাওয়া বুলেভার্ডটিও ভারী মনোরম। গাছতলায় এক বৃদ্ধ আইসক্রিম-স্যান্ডউইচ বিক্রি করছিল, মিতিনমাসি সাধাসাধি করলেও টুপুরের মোটেই খেতে ইচ্ছে হল না। বুমবুমকে বাদ দিয়ে সে একা-একা খাবে? তাই কি হয়?

কাছেই একটা ফুডকোর্টে রাতের খাওয়া সেরে ফের ট্যাক্সি। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়ির আরামে গল্প করতে করতে ফিরছে মাসি বোনঝি।

মিতিন জিজ্ঞেস করল, "কী রে, জায়গাটা কেমন লাগছে?"

"ভাল। খুব ভাল। আমাদের কলকাতাকেও যদি এমন বানিয়ে ফেলা যেত।"

"পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথা বলছিস? না রাস্তাঘাটের প্রশংসা করছিস? নাকি উঁচু-উঁচু বাড়ি আর আলোর বাহারে মন ভরেছে?"

"ডিসিপ্লিনের কথাও বলো।"

"আমার তো বাপু বড্ড বেশি কৃত্রিম লাগছে। বড় বেশি সাজানো। মাপা-মাপা। এমনকী মানুষগুলোও।"

"তবু... সাজানোটাকেও তো বাহবা দিতে হয়।"

"তাও... কেমন যেন প্রাণের অভাব রে। এই যে সেন্টোসায় আজ দু'-দু'খানা সি-বিচে গেলাম, ওখানকার বালিগুলো হাতে নিয়ে দেখেছিলি কি?"

"হ্যাঁ। মোটা-মোটা দানা।"

"প্রায় সরষের সাইজ়। বাজি রেখে বলতে পারি, ওই বিচগুলো মোটেই ন্যাচারাল নয়। পর্যটক টানার জন্য বালি ফেলে তৈরি করা হয়েছে," বলতে-বলতে হেসে ফেলল মিতিন, "অবশ্য শহরের নামটাই তো একটা বড়সড় ফাঁকি।"

"কীরকম?"

"ওমা, গল্পটা জানিস না? অনেক-অনেক বছর আগে প্যালেমবাং... মানে এখন যার নাম ইন্দোনেশিয়া... সেখানকার রাজা জাহাজে চড়ে সমুদ্রপথে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ঝড় আসে, রাজা আশ্রয় নেন এই দ্বীপে। তখন এখানকার এক জন্তুকে দেখে তাঁর সিংহ মনে হয়েছিল। ব্যস, অমনই দ্বীপটার নাম দিয়ে ফেললেন সিঙ্গাপুরা। লায়নস সিটি। অথচ এই দ্বীপের হাজার মাইলের মধ্যে কোনও সিংহ নেই।"

"ভারী অদ্ভুত তো!"

কথায়-কথায় হোটেল এসে গিয়েছে। মধ্যবয়সি চিনা চালককে ভাড়া মিটিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামল মিতিন আর টুপুর। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা, হোটেলের লাউঞ্জ শুনশান। শুধু শ্যামলা রং এক মালয়ী কন্যা বসে আছে রিসেপশন কাউন্টারে। মন দিয়ে ফ্যাশন শো দেখছে টিভিতে। সকালে বা সন্ধ্যায় এই মেয়েটি ছিল না। আজ বোধ হয় ওর নাইট ডিউটি।

মেয়েটির সঙ্গে মধুর হাসি বিনিময় করে মিতিন-টুপুর পায়ে পায়ে ১০৪-এর দরজায় পৌঁছে গেল। একবার টোকা দিতেই ভিতর থেকে পার্থর গলা, "খোলা আছে। চলে এসো।"

"আশ্চর্য, দরজাটা লাগিয়ে রাখোনি কেন?" ঘরে ঢুকে বিরক্ত স্বরে বলল মিতিন।

পার্থর হেলদোল নেই। টিভি চালিয়ে এক ইংরেজি সিনেমায় মগ্ন। পরদা থেকে চোখ না সরিয়ে বলল, "এই তো, একটু আগে উনি গেলেন।"

"কে?"

"সুজিত দত্ত।"

"তাই নাকি?"

"অনেকক্ষণ আড্ডা দিয়ে গেলেন। ঘণ্টাখানেক ছিলেন প্রায়।"

"অ। তা কী গপ্পো হল?"

"ওই কুম্ভকর্ণ নারায়ণ...উনিই তো অর্ধেক টাইম খেয়ে নিলেন।"

"কুম্ভকর্ণ নয়, কুম্ভকনম। ড্রেসিংটেবিলে ভ্যানিটিব্যাগ রাখতে-রাখতে মিতিন বলল, "কুম্ভকনম একটা জায়গার নাম।"

"জানি রে বাবা, জানি। কলকাতায় আমার গুচ্ছের তামিল বন্ধু আছে। ওরা নামের আগে বাবার নাম আর আদি বাসস্থানের নাম জুড়ে রাখে। প্র্যাকটিসটা ইন্ডিয়ার অনেক স্টেটেই চালু। কারও শুধু বাবার নাম থাকে, কারও দেশের নাম। যেমন ধরো..."

"লেকচার স্টপ," মিতিন ঘুরে তাকাল, "হঠাৎ মিস্টার নারায়ণের প্রসঙ্গ এল কেন?"

"আমি তুলিনি। সুজিতবাবু থাকাকালীনই নারায়ণ ফোন করলেন..."

"আবার ফোন করেছিলেন?"

"তা হলে আর বলছি কী," ঘুমন্ত বুমবুমের পাশে আধশোওয়া

ছিল পার্থ, উঠে সোজা হয়ে বসল, "এবার অবশ্য আর রেয়াত করিনি। দুমদাম পাঞ্চ ঝেড়েছি।"

"কী রকম?"

"স্ট্রেট বলে দিয়েছি, এভাবে বারবার জ্বালাতন করার জন্য চিঠিটা আর খুঁজবই না। স্ক্যান কপি দিয়েই কাজ চালিয়ে নিন, নইলে গোল্লায় যান। সকালে আসতেও বারণ করে দিয়েছি।"

"শুনে নারায়ণের কী রিঅ্যাকশান?"

"খুব হাউমাউ করছিল। বোধ হয় বার চল্লিশ প্লিজ়-প্লিজ় বলল," পার্থ চোখ টিপল, "আমি আর ওই মক্কেলকে কেন পাত্তা দেব, বলো? ওর আর আমাদের হ্যারাস করার ক্ষমতাই নেই। অন্তত এই হোটেলে। রিসেপশন থেকে জেনে নিয়েছি, রুমভাড়া আগাম দেওয়া আছে। ইন ফ্যাক্ট, পেঙ্গুইন এখানে একটা রুম পার্মানেন্টলি বুক করে রাখে। রেগুলার ক্লায়েন্ট আসে ওদের। তিন দিন, দু' রাতের প্যাকেজ এনজয় করে যায়।"

"অর্থাৎ কোম্পানিটা জেনুইন।" টুপুর ফুট কাটল, "প্রতি সপ্তাহেই সুডোকুর জন্য কাউকে না-কাউকে প্রাইজ় দেয়।"

"থাম তো! টুপুরকে মৃদু ধমক দিয়ে মিতিন ফের জেরা শুরু করল, "তোমার ওই চোটপাট শুনে সুজিত দত্ত কী বললেন?"

"কী আর বলবেন। জানতে চাইলেন ঘটনাটা কী।"

"তুমিও ব্যাকব্যাক করে সব উগরে দিলে?"

"আমার মনে কোনও প্যাঁচ নেই। তোমার মতো ঢাকঢাক গুড়গুড় আমার আসে না," পার্থ ঈষৎ অপ্রসন্ন। গজগজ করতে-করতে বলল, "ওরা যেচে বেড়াতে নিয়ে এল, আবার ওরাই অযথা ঝামেলা করছে... এমন বিদঘুটে খবরটা গোপন রাখতে যাবই বা কেন?"

"হুম।" টুল টেনে বসল মিতিন, বলল, "তা সুজিতবাবুর সঙ্গে আর কী কী গপ্পো হল?"

"বললাম তো, ওই নারায়ণকে নিয়েই... উনি তো চিঠি এপিসোড শুনে স্তম্ভিত। বললেন, 'এরকম আবার হয় নাকি? এমন কী মহামূল্যবান চিঠি, যার অরিজিনাল না হলে চলবে না?'"

"সুজিতবাবু চিঠিটা দেখার বাসনা প্রকাশ করেননি?"

"একবার ক্যাজুয়ালি বলেছিলেন। আমি খোঁজাখুঁজিতে যাইনি। বলেছি, ছাড়ুন তো মশাই, ওই চিঠি নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাবই না। থাকলে আছে, না থাকলে নেই। ব্যস।"

"হুম!" মিতিন চুপ করে রইল একটুক্ষণ। তারপর আবার জেরা শুরু, "আর কী কথা হল সুজিত দত্তর সঙ্গে?"

"এমনিই, এতাল-বেতাল। আমার প্রেস, ওঁর ব্যাবসা..."

"আমার প্রফেশনের গল্পও নিশ্চয়ই করেছ?"

"ওটা আমি ইচ্ছে করেই চেপে গিয়েছি। ভাবলাম, তুমি পছন্দ করবে কি করবে না..."

"যাক, একটাই বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছ তা হলে।"

বলেই মিতিন উঠে গেছে। বাথরুম থেকে জিনস-টি শার্ট বদলে নাইটি পরে এল। দেখাদেখি টুপুরও। এবার শোওয়ার আয়োজন করার পালা। টুপুরের জন্য বিকেলেই একটা নেয়ারের খাট দিয়ে গিয়েছে হোটেলের কর্মচারী। ভাঁজ করে রাখা ছিল খাটটা, খুলে বিছানা পাতল টুপুর। মিতিনও ভাল করে বিছানা ঝেড়ে নিল।

টিভি বন্ধ করল পার্থ। সোফায় গিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলেও রেখে দিল। এখানে এসে ভারী জব্দ হয়েছে সে। রুমে সিগারেট ধরাতে পারছে না। স্মোক অ্যালার্ম লাগানো আছে যে! ছোট্ট একখানা আড়মোড়া ভেঙে টুপুরকে জিজ্ঞেস করল, "তোরা বাইরে কী খেলি রে?"

"হাফ মালয়েশিয়ান, হাফ জাপানি। নাসি গোরেং, আর সুশি।"

"ওগুলো কী দ্রব্য?"

"নাসি গোরেং নুডলের মতোই। সঙ্গে সবজি, মাংসটাংস মেশানো থাকে। তবে টেস্ট চাইনিজের মতো নয়, অন্যরকম। আর শুশি তোমার ভাল লাগত না, একটু কাঁচা মাছের গন্ধ আছে।"

"ভালই হয়েছে তোদের সঙ্গে বেরোইনি। আমি বাবা এখানে পাতি ইন্ডিয়ান ডিশ খেয়েছি। পরোটা মাংস উইথ স্যালাড।

"আর বুমবুম?"

"ও ব্যাটা তো জাগলই না। সেন্টোসায় যা হাঁটাহাঁটি করেছে!"

মিতিন বিছানায় বাবু হয়ে বসেছে। আপন মনেই বলল, "সেন্টোসার ছবিগুলো একবার দেখলে হয়।"

"এত রাত্তিরে?" পার্থ চোখ কুঁচকোল, "পুরো একটা ক্যাসেট আছে কিন্তু। এক ঘণ্টার।"

"আহা, চলুক না খানিকক্ষণ। তোমার ব্যাটারিটাও মোটামুটি চার্জ্‌ড হয়ে যাবে।"

প্লাগ গুঁজে টিভির সঙ্গে যুক্ত হল হ্যান্ডিক্যাম। পরদায় ফুটে উঠল ছবি। গোড়ার দিকে নেহাতই হাবিজাবি। সেন্টোসা যাওয়ার পথে বড্ড উলটোপালটা ক্যামেরা চালিয়েছে পার্থ। অকারণে। ফার্স্ট ফরোয়াড করে ঢোকা হল সেন্টোসা পর্বে। প্রথমেই আন্ডারওয়াটার ওয়ার্ল্ড। হাঙর, অক্টোপাস, স্টিং রে, পিরান্‌হা, রাক্ষুসে কাঁকড়া। বেরিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সিলোসো বিচ। ইতালিয়ান রেস্তরাঁর অভ্যন্তর, বুমবুমের বৃষ্টিতে ছোটাছুটি, জলে গিয়ে পা ডোবানো, টুপুরের সঙ্গে খুনসুটি। ব্লু-লাইন, না রেডলাইন, কোনও একটা ভিড়-ভিড় বাসের অন্দরেও ঘোরানো হয়েছে হ্যান্ডিক্যাম। বাইরে থেকে মেরলিয়ন, সিংহের মুখে দাঁড়িয়ে সেন্টোসার নিসর্গ, দূরে সিঙ্গাপুরের উঁচু-উঁচু বাড়ি, জাহাজ, সবই ধরা আছে লেন্সে। আছে সেন্টোসার ট্রাম, রঙিন ডাস্টবিন, সাইনবোর্ড, ছবির মতো পাকখাওয়া পথঘাট, গাছপালা। ডলফিন শো তো প্রায় পুরোটাই

তুলেছে পার্থ। বাজনার তালে নাচ, উদবিড়ালের কেরামতি...

আচমকাই ডলফিননৃত্য স্থির করে দিয়েছে মিতিন। কী যেন দেখছে এক দৃষ্টে।

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

"ওই লোকটাকে মার্ক করো," টিভির পরদায় ফুটে থাকা ছবির বাঁ কোণটায় আঙুল দেখাল মিতিন, "ওই যে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, মাথায় টুপি, চোখে চশমা!"

টুপুর চোখ কুঁচকে বলল, "স্টিল কালারের সুট?"

"হ্যাঁ। লোকটাকে মেরলিয়নেও দেখলাম না?"

"ছিল নাকি?"

"মনে হচ্ছে। দাঁড়াও, রিওয়াইন্ড করি।"

ভুল বলেনি মিতিন। মেরলিয়নেও দেখা গেল লোকটাকে। আট-দশ জন টুরিস্টের মধ্যে মিশে রয়েছে। আরও পিছনো হল ক্যাসেট। কী কাণ্ড, সিলোসোতেও ফ্রেঞ্চকাট! এক জাপানি দলের পাশে দাঁড়িয়ে! আবার পিছোল ছবি। আন্ডারওয়াটার ওয়ার্ল্ডে ঢোকার মুখে, স্ন্যাক বারে বসে আছে লোকটা। ক্যামেরার দিকে পিঠ, তবে সুট আর টুপি দেখে চেনা যায়।

মিতিন টানটান হল, "ব্যাপারটা যেন কেমন-কেমন ঠেকছে না?"

পার্থ হাই তুলে বলল, "অমনই রহস্যের গন্ধ পেয়ে গেলে তো? আরে বাবা, আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা তো ঘুরতেই পারে।"

"এবং আমরা যেখানে যতক্ষণ কাটিয়েছি, লোকটাও ঠিক ততক্ষণই সেখানে কাটাতে পারে?"

"তাতেই বা কী আসে যায়?"

"যায়। যায়। আমার স্মৃতি যদি বিট্রে না করে, আমরা যখন যে বাসে উঠেছি, লোকটাও ঠিক সেই বাসই ধরেছে।"

"স্বাভাবিক। একই জায়গায়, একই সময়ে যেতে গেলে এক বাস তো ধরতেই হবে।"

"কিন্তু ওরকম দ্বিতীয় একটা লোককে পাচ্ছি না কেন? ...তোমার বাসের সিনটা দ্যাখো। টুপিওয়ালা লাস্ট সিটে বসে, খোলা ম্যাপে মুখের অনেকটাই ঢাকা। শুধু টুপি দেখা যাচ্ছে।"

"আশ্চর্য, বাসে তোমার কোনও সন্দেহ হল না? এখন বলছ?"

"শোনো, বাসে আমরা উঠেছি এক-দেড় ঘণ্টা পর পর। মাত্র তিনবার। লোকটাকে তখন খেয়াল করলেও আলাদা ভাবে চিহ্নিত করার মতো কোনও পরিস্থিতি হয়নি। তবু মনে একটা খচখচানি ছিল বলেই না রাতদুপুরে ক্যামেরা চালিয়ে বসলাম!"

"অর্থাৎ তোমার ধারণা, লোকটা আমাদের ফলো করছিল?"

"একটু একটু ধারণা তখন জন্মেছিল বটে। এখন ছবি দেখে নিশ্চিত হলাম। আড়ালে থাকার চেষ্টা করেও ঠিক কোনও না কোনও ভাবে ক্যামেরায় এসে গিয়েছে লোকটা।"

"কিন্তু ফলো করার একটা কারণ থাকবে তো? একটা অচেনা লোক কেন হঠাৎ...?"

"সেটা তো আমিও ভাবছি। যাক গে, মরুক গে, কাল সকালে আবার ঘর বদলানো আছে। তাড়াতাড়ি উঠতে হবে। এখন চলো, শুয়ে পড়া যাক।"

শোওয়াই সার। টুপুরের ঘুম আসছিল না। মস্তিষ্কে এক আজব উত্তেজনা। সিঙ্গাপুরেও একটা রহস্য এসে গেল তা হলে? কিন্তু সারা সন্ধে সে মিতিনমাসির সঙ্গে ছিল, তখন মিতিনমাসি কোনও আলোচনাই করল না কেন?

তবে কি রহস্য এখনও যথেষ্ট পাকেনি? হবেও বা।

॥ ৭ ॥

ঠিক যেন এক ঘন জঙ্গল। ছায়া ছায়া। জঙ্গল বেয়ে চলে গিয়েছে আঁকাবাঁকা পথ। কখনও সে পথ চড়াই ভাঙছে, কখনও উতরাই। গাছে-গাছে, ঝোপেঝাড়ে অসংখ্য পাখির ডাক। এমন পরিবেশে হঠাৎ এসে পড়লে চোখে যেন কেমন ঘোর লেগে যায়।

হ্যাঁ, বার্ড পার্কের ভিতরে পৌঁছে টুপুরের সেরকমই ঘোর লাগছিল। এত বিরাট এলাকা জুড়ে, এমন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শুধু পাখির বাগান তৈরি করা যায়? ঢোকার মুখে পেঙ্গুইনদের আস্তানাটাই তো জোর চমক। কাচের বরফঠান্ডা খাঁচায় কত রকম যে পেঙ্গুইন সেখানে। রাজা পেঙ্গুইন, বাদশা পেঙ্গুইন, পরি পেঙ্গুইন... ছোট্ট ছানা থেকে ইয়া-ইয়া ধাড়ি। কালো-কোটপরা উকিলবাবুদের জন্য পাহাড়, গুহা, নদীটদি বানিয়ে কী তোফা বন্দোবস্ত করা হয়েছে! প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজ তুলে গল্পগুজব করছে কেউ-কেউ। সাঁতার প্র্যাকটিসও চলছে জলে। কেউ বা উদাস নয়নে বসে। দুটো কিং পেঙ্গুইন তো জোর মারপিট শুরু করে দিল। দেখে বুমবুমের সে কী উল্লাস! দুই পালোয়ানের মধ্যে কে জেতে না জেনে সে নড়বে না। তাকে কোনওক্রমে টেনেটুনে সরিয়ে আনা গেল।

এখন অবশ্য বুমবুমের অন্য উত্তেজনা। জঙ্গলের মাথার উপর দিয়ে টয়ট্রেনে যাচ্ছে যে! ছোট্ট কামরায়। শুধু চারজনে। দু' ধারে, গাছগাছালির ফাঁকে-ফাঁকে খাঁচায় নানান দেশের পাখি। হর্নবিল, ম্যাকাও, কিংফিশার... বন্ধ কাচের জানলা দিয়ে বুমবুম তাদের

দেখছে, আর লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছে, "ওখানে যাব। ওখানে চলো।"

পিচের রাস্তা দিয়ে অনেকেই ঘুরছে পায়ে হেঁটে। সেদিকে ক্যামেরা তাক করে পার্থ বলল, "ঠিক বলেছিস। আমাদের পা-গাড়ি ধরাটাই উচিত ছিল।"

টুপুর বলল, "তা হলে কিন্তু টয়ট্রেনের আনন্দটা মিস হত।"

"তা-ও তো বটে," বলেই পার্থ মিতিনের দিকে ফিরল, "কী গো, তুমি এত চুপচাপ কেন? কালকের কথাই ভেবে যাচ্ছ নাকি?"

মিতিন অস্ফুটে বলল, "নাঃ, আজকের কথা ভাবছি।"

"আজকেও কেউ ঘুরছে নাকি পিছন-পিছন?"

"এখনও পর্যন্ত তো মনে হচ্ছে, না।"

"পরেও দেখবে কেউ নেই। কালও ছিল না। সবটাই তোমার মনগড়া। কে এক অজানা অচেনা টুরিস্ট...অকারণে তাকে সন্দেহ করে নিজের ভিতর ভুলভাল টেনশন তৈরি করছ।"

"অকারণ হলেই ভাল। তবে আমার মন বলছে..."

"মনকে ঘুম পাড়িয়ে দাও," পার্থ হ্যা-হ্যা হাসল, "সিঙ্গাপুরে তো আছ আর মাত্র দেড়টা দিন। টিকটিকিপনা ছেড়ে বেড়ানোটাকে ভালভাবে এনজয় করো দেখি!"

খেলনা-ট্রেন এক পুঁচকে স্টেশনে থেমেছে। লাফাতে-লাফাতে নেমে পড়ল বুমবুম। সঙ্গে টুপুর-মিতিন-পার্থও। খুদে প্ল্যাটফর্ম টপকে সোজা টিয়া, রোজেলার আড়তে। গাছে-গাছে পাখিদের কিচিরমিচির। গায়ে তাদের কত রকম যে রং। মনে হয় লাল-নীল-হলুদ-সবুজ-কমলা, সব ক'টা রঙে কেউ ছাপিয়ে দিয়েছে তাদের। রবিবার বলেই বোধ হয় আজ দর্শক অনেক। ছোট-ছোট বাটিতে তারা দানাপানি ধরছে, অমনই পাখির ঝাঁক নেমে এসে বসছে তাদের কাঁধে, হাতে, মাথায়। ধারালো ঠোঁটে টপাটপ

সাবাড় করছে খাবার। হালকা করে ঠুকরেও দিচ্ছে মাঝে-মাঝে।

টুপুর উচ্ছ্বসিত মুখে বলল,"মার্ভেলাস! কলকাতায় এমন একটা পার্ক বানানো যায় না? যেখানে পাখিগুলো ছাড়া থাকবে? খোলা আকাশে উড়ে-উড়ে বেড়াবে?"

"এখানেও মোটেই খোলা আকাশে উড়ছে না, টুপুর।" পার্থ আঙুল তুলে দেখাল, "ওই দ্যাখ, উপরে সরু-সরু জাল। জালটা একটু বেশি উঁচুতে, এই যা।"

"তা হোক। স্বাধীনভাবে তো ওড়াওড়ি করতে পারছে। গাছে বাসা বেঁধে থাকছে..."

বলতে-বলতে হঠাৎই টুপুরের কথা আটকে গেছে। সামনে এক বিচিত্র দৃশ্য। মিতিনমাসি বাটি ধরে বহুরঙা রোজেলাদের খাওয়াচ্ছিল। তাদের মধ্যেই একজন বুমবুমের মাথায় এখন। আতঙ্কে বুমবুম পাথরের মতো স্থির। আড়ষ্ট স্বরে শুধু বলে চলেছে, "ভাল হবে না বলছি। যা, উড়ে যা।"

টুপুরের পেট গুলিয়ে হাসি উঠে এল। তাই দেখে বুমবুম আরও কাঠ, "দিদি, ওকে এখনই তাড়িয়ে দে।"

"আহা, থাক না। কিছু তো করছে না।"

"করবে। এখনই মাথায় পটি করে দেবে।"

লাল-ঠোঁট রোজেলা বুঝতে পারল কিনা কে জানে, বুমবুমকে রেহাই দিয়ে এক সাহেবশিশুর মাথায় গিয়ে বসেছে। সম্ভবত পটি করার জন্য কালো চুলের চেয়ে সোনালি চুল তার বেশি পছন্দ হল।

বুমবুমের পক্ষীপ্রেম উবে গেছে। এ তল্লাটে আর এক মুহূর্ত থাকতে রাজি নয়। অগত্যা রোজেলাপট্টি ফেলে শুরু হল হাঁটা। খাঁচার পাখিগুলোকে দেখে তেমন একটা আহ্লাদ হল না টুপুরের। এমন তো কলকাতায় চিড়িয়াখানাতেও দেখা যায়। এখানে শুধু সবুজের আধিক্য, এই যা।

ঘুরতে-ঘুরতে শেষে এক কৃত্রিম জলপ্রপাতের সামনে। চতুর্দিকে লম্বা-লম্বা গাছপালা লাগিয়ে এমন একটা ধোঁয়া-ধোঁয়া অরণ্য বানানো হয়েছে, সত্যিই রেনফরেস্ট বলে ভুল হয়। জলপ্রপাতটিকেও মনে হয় না মেকি। বেশ লাগে দেখতে।

পার্থও প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তারিফের সুরে বলল, "আইডিয়াটা গ্র্যান্ড। কোন হাইট থেকে জল ফেলা হচ্ছে লক্ষ করেছিস?"

টুপুর বলল, "মিনিমাম একশো ফিট তো হবেই।"

"আরও বেশি। এটাই মানুষের তৈরি সবচেয়ে উঁচু জলপ্রপাত। পার্কটার গ্ল্যামারই বাড়িয়ে দিয়েছে এই ওয়াটারফল।"

"পাখিরাও বোধ হয় এই রেনফরেস্ট এরিয়াটা বেশি পছন্দ করে।"

"হুম। প্রচুর কাকাতুয়া উড়ছে। জাম্বো সাইজের পায়রাও।"

"কিন্তু একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ, পার্থমেসো?"

"কী রে?"

"পাখিদের রাজ্যে একটাও কাক নেই।"

"কাক কি তুই সিঙ্গাপুর শহরেও দেখতে পেয়েছিস?"

"এখনও তো নজরে পড়েনি।"

"পাবি না। নেই। একসময় যা-ও ছিল, এখন ঝাড়েবংশে নির্মূল হয়ে গিয়েছে। কাক শহর নোংরা করে বলে সিঙ্গাপুরে তাদের নো এন্ট্রি।"

"অদ্ভুত তো! আমি তো জানতাম কাক ঝাড়ুদার পাখি। নোংরা খেয়ে সাফ করে।"

"সিঙ্গাপুরিরা হয়তো সেটা মানে না।"

জবাবটা মনঃপূত হল না টুপুরের। এখানকার কাকদের জন্য একটু যেন মনখারাপই হল। পায়ে-পায়ে পার্থমেসোর সঙ্গে এল ছাউনি ঢাকা এক চাতালে। পার্থ তিনটে কফির অর্ডার দিল স্ন্যাক বারে। আর বুমবুমের জন্য চিপ্‌স।

মিতিন বুমবুমকে নিয়ে টয়লেটে গিয়েছিল। ফিরে বলল, "এখন কফি? চিপ্‌স? সাড়ে বারোটা বাজে, দুপুরের খাওয়া হবে কখন?"

পার্থ কাপে চুমুক দিয়ে বলল, "লাঞ্চ করব লিট্‌ল ইন্ডিয়াতে গিয়ে। ওখানে অনেক বাংলাদেশি হোটেল দেখেছি। গরম-গরম মাছভাত খাব। কাল সুজিতবাবু বলছিলেন, ওখানে নাকি দারুণ শুঁটকি পাওয়া যায়।"

সুজিত দত্তর নাম উঠতেই মিতিনের চোখ তেরচা, "তোমার সুজিত দত্ত সকালে হঠাৎ হোটেল ছেড়ে চলে গেলেন যে বড়?"

পার্থ হাত উলটে বলল, "হয়তো কাজকর্ম মিটে গিয়েছে, তাই।"

"চলে যাবেন, এটা তোমায় কাল বলেছিলেন?"

"নাঃ। সেরকম কোনও প্রসঙ্গ তো ওঠেনি। আমিও জানাইনি, আজ আমরা রুম চেঞ্জ করছি।" পার্থর চোখ সরু, "আচ্ছা, তুমি সুজিতবাবুকে নিয়ে পড়েছ কেন বলো তো? ভদ্রলোক গায়েপড়ে আলাপ করেছিলেন বলেই তাঁকে বাঁকা চোখে দেখতে হবে?"

"আমি সোজা বাঁকা কোনও চোখেই দেখছি না। জাস্ট জানতে চাইছি।"

"বললেই মানব? তুমি মগজ থেকে কিছুতেই পোকাটাকে তাড়াতে পারছ না। ওই পোকাই ভোঁ-ভোঁ করে বলছে, তোমার পিছনে কেউ ফেউ লাগিয়েছে! অমুক লোক তমুক প্রশ্ন করল কেন... নারায়ণের চিঠি চাওয়ার পিছনে নিশ্চয়ই কোনও গভীর মানে আছে... এমনকী একটা নর্মাল টেলিফোন... সুজিতবাবু থাকাকালীন সেটা আসতেই পারে... তাও তুমি সোজা মনে নিতে পারনি। অথচ সাদা চোখে দেখলে গোটা ব্যাপারটাই জলবৎ তরলং।"

"তাই বুঝি?"

"আমার সুডোকু মেলানো ব্রেন তো সেরকমই বলে ... শোনো, মিস্টার নারায়ণ নেহাতই তাঁর কোম্পানির এক জো-হুজুর কর্মচারী।

যেহেতু তাঁকে বলা আছে অরিজিনাল আমন্ত্রণপত্র কালেক্ট করতে হবে, উনি বাধ্য দাসানুদাসের মতো ঘ্যানঘ্যান করে যাচ্ছিলেন। ওঁকে একটা ধাতানি দেওয়ার দরকার ছিল। দিয়েওছি। ফল নিজের চোখেই দেখলে। সকালে উনি আর হোটেলের ছায়া মাড়াননি। সুজিতবাবুও কাজ চুকে গেলে চলে যাবেন, এটাও একদম স্বাভাবিক। অতএব বুঝতে পারছ তো, তোমার কেতাবি সন্দেহগুলো নিছকই হাস্যকর?"

মিতিন কোনও জবাব দিল না। চিলতে হাসল শুধু। ওই হাসি দেখে টুপুর বেশ আন্দাজ করতে পারল, পার্থমেসোর একটা যুক্তিও হজম করেনি মিতিনমাসি। বোঝাই যায়, এখন থট প্রসেস চলছে। শত খোঁচালেও মাসি এই মুহূর্তে রা কাড়বে না।

কিন্তু কেসটা কী? রহস্যটা কোথায়?

বাংলাদেশি হোটেলে খ্যাটন মন্দ হল না। ভাত, ডাল, আলুভরতা, সর্ষেইলিশ, পাঁঠার মাংস। খুব চেকনাদার রেস্টুরেন্ট অবশ্য নয়, তবে রান্না দিব্যি সুস্বাদু। লিটল ইন্ডিয়ার এদিকটায় পর পর এরকম খাওয়ার জায়গা রয়েছে কয়েকটা। বাংলাদেশিদের দোকানবাজারও। বাংলা ভাষা ভাসছে বাতাসে। সামনেই মুস্তাফা সেন্টার। ভারতীয় ব্যবসায়ীর তৈরি প্রকাণ্ড ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। বহুতল ওই বাড়িতে কী না পাওয়া যায়। বহুমূল্য গয়নাগাটি থেকে ব্যথাবেদনার মলম পর্যন্ত।

টুপুরের ইচ্ছে ছিল মুস্তাফায় একবার ঢুঁ মারার। পার্থর ঘোরতর আপত্তি। ভরপেট আহারের পর হোটেলে ফিরে সে একটু গড়াতে চায়। মুস্তাফা চব্বিশ ঘণ্টা খোলা, যে-কোনও সময় এলেই হবে।

বাঙালি-বাঙালি এলাকাটা থেকে কার্লটন হোটেল খুব দূরে নয়। হাঁটাপথে মিনিটপাঁচেক। হোটেলে পৌঁছে জোর ঘাবড়ে গেল টুপুর।

বেজায় হল্লাগুল্লা চলছে লাউঞ্জে। এক মধ্যবয়সি গুজরাতি দম্পতি আঙুল নেড়ে-নেড়ে শাসাচ্ছেন হোটেলের কর্মচারীদের। সুট-টাইপরা ম্যানেজার প্রাণপণে শান্ত করার চেষ্টা করছেন তাঁদের।

ব্যাপারটা কী শুনে টুপুর তো আরও থ। সকালে তারা যে ঘরটা ছেড়ে দিয়েছিল, সেখানেই উঠেছেন ওই দম্পতি। স্নানটান সেরে কাছেই লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। ফিরে দ্যাখেন, ঘরের লণ্ডভণ্ড দশা। কোনও এক বদমাইশ ব্যাগ সুটকেস খুলে যাবতীয় জিনিসপত্র ছত্রাকার করে দিয়ে গিয়েছে। কপাল ভাল, কিছু খোয়া যায়নি। সম্ভবত সময় পায়নি চোর। স্বামী-স্ত্রীর রাগ অবশ্য তাতে পড়ছে না। এই যদি কার্লটন হোটেলের নিরাপত্তার ছিরি হয়, এখানে তাঁরা দুটো দিন কাটাবেন কোন ভরসায়?

উপরে নিজেদের নতুন রুমে এসে পার্থ বলল, "জোর বাঁচা বেঁচে গিয়েছি রে টুপুর। ভাগ্যিস তোর কথামতো ঘর বদলেছিলাম। নইলে হয়তো ওই ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার বদলে আমাদেরই এখন ওখানে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করতে হত।"

টুপুর বলল, "কী আশ্চর্য কাণ্ড! সিঙ্গাপুরে এত কড়াকড়ি, এখানেও তবে চুরিবাটপাড়ি হয়?"

"তাই তো দেখছি। আমি তো আবার ডলারের অর্ধেকটাই সুটকেসে রেখে গিয়েছিলাম। নির্ঘাত আজ হাপিশ হয়ে যেত।"

মিতিন গুম হয়ে বসে ছিল। হঠাৎ বলে উঠল, "না। আর যাই হোক, ডলার খোয়া যেত না।"

"কী করে বুঝলে?"

"তোমাদের মাথায় কি গোবর পোরা? এ-ও বুঝলে না, চোর ডলার হাতাতে আসেনি। ঘড়ি, ক্যামেরা বা আর কিছুও নয়? এসেছিল অন্য কিছুর সন্ধানে?"

"কী সেটা?"

"এমন কিছু, যা ওসবের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। এবং জিনিসটা সে খুঁজতে এসেছিল ওই গুজরাতি স্বামী-স্ত্রীর ব্যাগে নয়। আমাদেরই ব্যাগে।"

একসঙ্গে পার্থ আর টুপুর বলে উঠল,"মানে?"

"কারণ, জিনিসটা আমাদের কাছেই থাকার কথা। আমরা যে রুম পালটেছি, সেটা চোর তো আর জানত না।"

"ও," পার্থ থমকে গিয়েছে। খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি বলতে চাইছ, ওই চিঠিটা...?"

"মনে তো হচ্ছে, তাই।"

"তা হলে কি মিস্টার নারায়ণই...?"

"স্বয়ং না-ও আসতে পারেন। হয়তো কাউকে পাঠিয়ে..। কিংবা এখানকারই কোনও কর্মচারীর সঙ্গে যোগসাজস করে... কিংবা হয়তো সম্পূর্ণ অন্য কেউ..."

টুপুর বলে উঠল, "তুমি কি সুজিত দত্তর দিকে ইঙ্গিত করছ?"

"ইঙ্গিত করছি না। শুধু মাথায় রাখতে বলছি, রুম চেঞ্জের খবরটা তিনিও জানতেন না," মিতিন ভুরু বেঁকিয়ে পার্থকে বলল, "কী, তাই তো?"

পার্থ জোরে-জোরে ঘাড় নাড়ল, "অবশ্যই। আমি ওঁকে মোটেই বলিনি। তা ছাড়া উনি তো কলকাতায় ফিরে গিয়েছেন!"

"সেটা তুমি হলপ করে বলতে পার না। উনি হোটেল ছেড়ে দিয়েছেন, এটুকুই সত্যি। মনে রেখো, সিঙ্গাপুর থেকে কলকাতা যাওয়ার ফ্লাইট একটাই। রাত ন'টায়। ওই প্লেনে ওঠার জন্য কেউ ভোরবেলা হোটেল ছাড়ে না।"

"কিন্তু সুজিত দত্তর সঙ্গে ওই চিঠির কী সম্পর্ক? বরং মিস্টার নারায়ণের ইন্টারেস্ট থাকলেও থাকতে পারে। যদিও তাঁর পক্ষে দিনদুপুরে লাগেজ হাতড়ানো যথেষ্ট অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে।"

"বা রে, মিতিনমাসি তো বলছে চিঠিটা হয়তো খুব মূল্যবান," টুপুর মন্তব্য জুড়ল, "তাই যদি হয়, ওটা মিস্টার নারায়ণেরই কাজ। আমি শিওর।"

"ধুত্তোর ছাই," পার্থ মাথা ঝাঁকাল, "চিঠিটা কেন মূল্যবান, তার তো একটা যুক্তি দেখাবে। প্রত্যেক সপ্তাহেই আমার মতো কেউ না-কেউ সুডোকু মিলিয়ে সিঙ্গাপুর টুর প্রাইজ পাচ্ছে। প্রত্যেকের কাছেই অবিকল এরকম চিঠি থাকে। এর মধ্যে আমাদেরটা ফর নাথিং হঠাৎ মূল্যবান হয়ে উঠবে কেন?"

মিতিন থমথমে মুখে বলল, "এটাই তো একটা সুডোকু।"

॥ ৮ ॥

বিকেল প্রায় শেষ। চা-টা খেয়ে পার্থ তৈরি। বুমবুমকে নিয়ে যাচ্ছে সিঙ্গাপুরের চিড়িয়াখানায়। নাইট সাফারিতে। কবজিতে ঘড়ি বাঁধতে-বাঁধতে টুপুরকে বলল, "কী রে, তোরা তা হলে যাচ্ছিস না? ফাইনাল?"

টুপুর অসহায় মুখে মিতিনমাসিকে দেখল। সেই যে দুপুর থেকে চোখ ঢেকে শুয়ে আছে মাসি, এখনও ওঠার কোনও লক্ষণ নেই। কাচুমাচু মুখে টুপুর বলল, "কী করব, মিতিনমাসি আমাকে থেকে যেতে বলছে যে।"

"তা হলে আর কী, মাসি-বোনঝি ঘরে বসে ভ্যারেন্ডা ভাজ। থুড়ি, ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ চালা," পার্থ মুখভঙ্গি করল, "অবশ্য তোর দুধের স্বাদ আমি ঘোল খাইয়ে পূর্ণ করে দেব। রাত্তিরে নাইট সাফারির ছবি দেখে নিস।"

তখনই হঠাৎ মিতিনের গলা শোনা গেল, "টুপুর, তোর মেসোকে বল হ্যান্ডিক্যাম যেন না নিয়ে যায়। ক্যামেরা মোবাইলটাও থাকুক।"

পার্থ আকাশ থেকে পড়ল, "কেন?"

"দরকার আছে।"

"তোমার এই পাগলামির কিন্তু আমি কোনও মানে খুঁজে পাচ্ছি না। পার্থ বিরক্ত স্বরে বলল, "শুধু শুধু তিলকে তাল করছ।"

"তিল যদি নিজেই তাল হতে চায়, আমি কী করতে পারি?"

"করো যা খুশি। সিঙ্গাপুরে বসে তালের বড়া ভেজে খাও।"

বলেই বুমবুমের হাত ধরে গটগটিয়ে বেরিয়ে গেছে পার্থ। টুপুর হতবুদ্ধির মতো বসেই আছে বিছানায়। নাইট সাফারিতে যাওয়া হল না বলে একটু-একটু দুঃখ হচ্ছে বটে। আবার তাকে দরকারে লাগবে বলে মিতিনমাসি আটকে রাখল ভেবে, পুলকও জাগছে অল্প-অল্প। কিন্তু মিতিনমাসি ওঠে না কেন? কতক্ষণ শুয়ে থাকবে?

পায়ে-পায়ে ব্যালকনিতে এল টুপুর। লাগোয়া ব্যালকনিখানা ছোট হলেও ভারী সুন্দর। দূরে একটা পার্ক দেখা যাচ্ছে। এ শহরের অজস্র পার্কের মতোই গাঢ় সবুজ। চওড়া রাস্তাও চোখে পড়ে। দেখা যায় গাড়িঘোড়া, মানুষজন। এই অঞ্চলের বাড়িগুলো সিঙ্গাপুরের আর পাঁচটা জায়গার মতো নয়। বহুতল তো প্রায় নেইই। বেশির ভাগই একতলা, কী দোতলা! একটু যেন ঘিঞ্জি। কোথায় যেন কলকাতার সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। এদিককার হোটেলে উঠে একটা ব্যাপার অন্তত বোঝা গেল, সিঙ্গাপুরের সর্বাঙ্গই খুব ঝকমকে নয়।

মিতিন ডাকছে ভিতর থেকে। ঘরে ফিরে টুপুর অবাক। বিছানা ছেড়ে কখন যেন উঠে পড়েছে মিতিনমাসি। টিভিতে ক্যামেরা লাগিয়ে আবার দেখছে সেন্টোসার ক্যাসেটখানা।

টুপুর বসে পড়ল পাশে, "কী খুঁজছ গো? কালকের সেই লোকটাকে?"

"হুম।"

টুপিওয়ালা ফ্রেঞ্চকাট অনেকবারই ধরা পড়ছে পরদায়। কিন্তু কিছুতেই মুখটা জুতসইভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। কখনও সাইড-ফেস। কখনও পিছন ফেরা। বাসে তো টুপি আর ম্যাপে মুখ প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। অবশেষে ডলফিন লেগুনের ছবিটাই কাজে লাগল। ঝলকের জন্য হলেও স্পষ্ট হয়েছে মুখমণ্ডল। সঙ্গে-সঙ্গে ছবিটাকে দাঁড় করিয়ে জুম টিপল মিতিন। অনেকটা বড় হয়েছে ছবি। তবে সামান্য ফেটে-ফেটে গেল।

পরদায় দৃষ্টি গেঁথে মিতিন বলল, "দ্যাখ তো ভাল করে, চেনা-চেনা লাগে কিনা?"

টিভির খুব কাছে মুখ নিয়ে গেল টুপুর। চোখ পিটপিট করে বলল, "নাঃ, লোকটার নাক যা প্রকাণ্ড..."

"নাক তো বানানো যায়। নাকটাকে ছেঁটেকেটে দ্যাখ। দাড়ি আর টুপিও বাদ দে।"

"উঁহু, বুঝতে পারছি না। মিস্টার দত্তর সঙ্গে মিল আছে কি?"

আরও দু'-চার সেকেন্ড ছবিটাকে পর্যবেক্ষণ করে ক্যামেরা অফ করল মিতিন। বিড়বিড় করে বলল, "ভদ্রলোক ছদ্মবেশ ধরাতে খুব পটু। ফলো করাতেও। যদি ভদ্রলোক সুজিত দত্তই হন, আমাদের পিছন-পিছন ঘুরছিলেন কেন?"

"চিঠিটার জন্য কি?"

"অথচ একবারও তো আমাদের কাছাকাছি এলেন না? যদি ধরেও নেন বস্তুটি আমাদের সঙ্গে আছে, তা হলে তো উনি কাড়ার চেষ্টা করতেন?"

"তা হলে বোধ হয় উনি মিস্টার নারায়ণ।"

"দুর বোকা। সে লোকটাই বা হামলাটামলা না করে স্রেফ ঘুরে বেড়াবে কেন? তা ছাড়া মিস্টার নারায়ণের হোটেলে বসে থাকাটাই বলে দিচ্ছে..."

"উনি নিজেও যাননি। এবং কোনও লোকও পাঠাননি," টুপুর কথা মাঝপথ থেকে কেড়ে নিল। হতভম্ব মুখে বলল, "তা হলে লোকটা কে?"

"উঁহু। প্রশ্নটা 'কে' নয়। প্রশ্নটা হল 'কেন'?"

"মানে?"

মিতিন উত্তর দিল না। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তিন মিনিটে রেডি হয়ে নে। বেরোব।"

"কোথায় যাবে?"

"প্রশ্ন নয়। যা বলছি, কর।"

নিজেও চটপট চুলে চিরুনি চালাল মিতিন। সালোয়ার-কামিজের ওপর ওড়না বিছিয়ে দ্রুত নেমে এল নীচে। রিসেপশনে গিয়ে হাসি-হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল, "১০৪ নম্বর রুমের কেসটার কোনও ফয়সালা হল?"

কাউন্টারে এখন এক মিষ্টিমুখ চিনা মেয়ে। সে ভারী লজ্জিত

মুখে বলল, "নো ম্যাম। তবে ঘটনাটির জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। বিশ্বাস করুন, এ হোটেলে আগে কখনও এমনটা হয়নি।"

"আপনি কি জানেন, আমরা ওই রুমেই ছিলাম? ইনফ্যাক্ট, আজও ওখানে থাকার কথা ছিল? সকালেই আমরা রুম চেঞ্জ করে তিনতলায় গিয়েছি? ৩২২-এ?"

"জানি ম্যাডাম। ডিউটিতে এসে শুনেছি।"

"ঘটনাটায় আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বোধ করছি। আপনারা কি পুলিশকে জানিয়েছেন?"

"পুলিশকে এখনই জানালে হোটেলের বদনাম হয়ে যাবে, ম্যাডাম। আমাদের মালিক আর ম্যানেজার নিজেরাই থরো এনকোয়ারি করে দেখছেন। তেমন হলে নিশ্চয়ই পুলিশকে..."

"আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?"

"বলুন।"

"একজন থার্ড পার্সন রুম খুলল কী করে?"

"সেটাই তো পরিষ্কার হচ্ছে না, ম্যাডাম। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস পটেল তো চাবি সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন।"

"চাবির ডুপ্লিকেট আছে না?"

"তা আছে।"

"রিসেপশনেই থাকে?"

"হ্যাঁ, ম্যাম," চিনা মেয়েটি অধোবদন।

"অর্থাৎ আপনাদের লোকও ইচ্ছে করলে রুমে ঢুকতে পারে?"

"না ম্যাডাম। নেভার। বোর্ডারের অনুমতি ছাড়া রুম আমরা খুলতে পারি না।"

"ও। তার মানে লক ভেঙে কেউ ঢুকেছিল?"

"লক ভাঙা হয়নি ম্যাডাম। আমরা চেক করেছি।"

"তা হলে তো সন্দেহ আপনাদের কর্মচারীদের দিকেই যায়!"

"সব কর্মচারীকেই ক্রস করা হচ্ছে। যদি কাউকে দোষী মনে হয়, তার বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ম্যাডাম, পুলিশের হাতে পড়লে তারা পেট থেকে কথা টেনে বের করবেই।"

"দ্যাট্স গুড...যাক গে, আপনাকে বিব্রত করার জন্য দুঃখিত।"

"আমাদেরই তো দুঃখিত হওয়ার কথা ম্যাডাম। এবং এমন ঘটনা যাতে না ঘটে, সেটা দেখাও আমাদের কর্তব্য।"

"শুনে ভাল লাগল। আর একটা-দুটো প্রশ্ন করতে পারি কি?"

"স্বচ্ছন্দে। বলুন?"

"ঘটনাটা ঠিক কখন ঘটেছিল?"

"সঠিক টাইম বলতে পারব না ম্যাডাম। তবে মিস্টার পটেলরা বেরিয়েছিলেন এগারোটা নাগাদ। ফিরে আসেন দেড়টার সময়..."

"আপনি নিশ্চয়ই তখন ডিউটিতে ছিলেন না?"

"না। আমার আজ ইভনিং শিফ্ট। দুটোয় এসেছি। আজ মর্নিং ছিল রোজির।" বলেই চিনা মেয়েটি যেন কেঁপে গেল, "রোজি খুব ভাল মেয়ে ম্যাডাম। ও সত্যিই কিছু জানে না।"

"রোজি কি কাউকে ১০৪-এর দিকে যেতে দেখেছিলেন?"

"না ম্যাডাম। সেভাবে বোধ হয় বলা সম্ভবও নয়। সারাক্ষণই কাস্টমাররা আসা-যাওয়া করছেন..."

"রোজির কাছে কেউ ১০৪-এর বোর্ডারদের সম্পর্কে খোঁজও করেননি?"

"বোধ হয় না। তা হলে তো রোজি বলত।"

"আচ্ছা, আর-একটা খবর দিতে পারেন?" মিতিন সামান্য ঝুঁকল এবার, "আমার কাছে একটা গাড়ির নম্বর আছে। গাড়ির মালিকের নাম জানতে চাই..."

"সিঙ্গাপুরে এটা কোনও সমস্যাই নয় ম্যাডাম। ইন্টারনেটে মোটর ভেহিকল্‌সের ওয়েবসাইটে চলে যান।"

"থ্যাঙ্কস। এখানে কাছাকাছি সাইবার কাফে কোথায় আছে?"

"এই সার্ভিসটুকু আমরাই প্রোভাইড করতে পারি। অনুগ্রহ করে আমায় যদি নম্বরটা দেন..."

"এস-জি-কে টু ফাইভ এইট নাইন। সাদা রঙের মিৎসুবিশি।"

"দু' মিনিট, ম্যাডাম।"

ডেস্কের কম্পিউটারে মনোযোগী হয়েছে চিনা মেয়েটি। টকাটক কী টিপছে। দু' মিনিট নয়, সময় নিল মিনিটপাঁচেক। মনিটরে চোখ রেখে বলল, "এটা তো একটা ট্র্যাভেল এজেন্সির গাড়ি ম্যাডাম।"

মিতিন উৎসুক স্বরে বলল, "এজেন্সির নাম?"

"ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট। ঠিকানা, ইস্ট-এন্ড মল, গ্রাউন্ড ফ্লোর, শপ নম্বর থ্রি সি।"

"লোকেশনটা জানতে পারি?"

"অবশ্যই। সিমেই।"

"ট্র্যাভেল এজেন্সির প্রোপ্রাইটারের নাম পাওয়া যাচ্ছে?"

"হ্যাঁ, ম্যাম। টি পি শঙ্করন।"

"অনেক-অনেক ধন্যবাদ," মিতিন কাউন্টার থেকে সরতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়াল, "আচ্ছা, সিমেই যাওয়া যায় কী করে?"

"ট্যাক্সিতে যেতে পারেন। কিংবা এম-আর-টি। সিঙ্গাপুরের এই ট্রেন সার্ভিস কিন্তু অতুলনীয় ম্যাডাম। ট্রেনে করে শহরের যে-কোনও জায়গায় চলে যেতে পারেন। তবে হ্যাঁ, লিটল ইন্ডিয়া থেকে সিমেই যেতে গেলে আউটরাম পার্ক স্টেশনে ট্রেন বদলাতে হবে। ওখান থেকে ধরবেন পূর্ব-পশ্চিম লাইনের ট্রেন। আশা করি, বোঝাতে পেরেছি?"

"একদম," মিতিন এবার একটা চওড়া হাসি উপহার দিল

মেয়েটিকে। টুপুরকে বলল, "চল, সিমেই ঘুরে আসি।"

রাস্তায় বেরিয়ে টুপুর জিজ্ঞেস করল, "ট্র্যাভেল এজেন্টের কাছে গিয়ে কী হবে মিতিনমাসি?"

"দেখা যাক। সূত্র কিছু তো মিলতেও পারে।"

"রিসেপশনের মেয়েটিকে জেরা করে কিছু লাভ হল?"

"না। হওয়ার কথাও নয়।"

"কেন?"

"জানাই ছিল, রুম খোলাখুলিতে হোটেলের স্টাফ যুক্ত থাকতে পারে না।"

"কীভাবে শিওর হলে?"

"সোজা বুদ্ধিতে। ঘর বদলানো তো হোটেলের লোকদের অগোচরে হয়নি। তারা কেউ জড়িত থাকলে ১০৪-এ নয়, ৩২২-এ ঢুকত।"

"তা হলে ফালতু-ফালতু মেয়েটাকে অত জেরা করছিলে কেন?"

"দুটো কারণে। এক, আমাদের ৩২২ এখন থেকে পুরোপুরি সুরক্ষিত থাকবে। দুই, প্রশ্নের ধাক্কায় মেয়েটাকে নার্ভাস করে দিয়ে গাড়ি সংক্রান্ত খবরটাও বের করে নেওয়া গেল। আমার সময়ও বাঁচল, পরিশ্রমও বাঁচল..."

"বুঝলাম।"

কথা বলতে-বলতে হাঁটছে দু'জনে। লিটল ইন্ডিয়ার এম-আর-টি স্টেশন টুপুর চেনে মোটামুটি। ট্যাক্সিতে যাতায়াতের সময় নজরে পড়েছে। তাদের হোটেল থেকে পঞ্চাশ-ষাট পা গেলে সেরাংগুন রোড। চওড়া রাস্তাটা টপকে বাফেলো স্ট্রিট ধরে পৌঁছতে হয়।

স্টেশনে নেমে টুপুর দেখল, টিকিট-কাউন্টারের কোনও বালাই নেই, তার জায়গায় শোভা পাচ্ছে সার দিয়ে বসানো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। টিকিট কাটার ওই যন্ত্রের গায়ে ট্রেন রুটের ম্যাপ। গোটা শহরে

টিকিট সংগ্রহ করার ব্যবস্থাও ভারী সরল। যেখান থেকে যেখানে যাবে মানচিত্রে শুধু আঙুল ছুঁইয়ে দাও, পরদায় ফুটে উঠবে ভাড়া কত। সেইমতো ডলার ঢুকিয়ে দাও নির্দিষ্ট ফোকরে, তলা দিয়ে বেরিয়ে আসবে ফেরত খুচরোসহ একটা শক্তপোক্ত কার্ড। অনেকটা কলকাতার মেট্রোরেলের স্মার্টকার্ডের মতো।

প্ল্যাটফর্মের গেটে কার্ড ছুঁইয়ে ভিতরে ঢুকতে না-ঢুকতেই ট্রেন। থামার সঙ্গে-সঙ্গে খুলে গেল বন্ধ দরজা, যাত্রীরা উঠতেই আটকে গেল নিঃশব্দে। কামরাটি বেশ প্রশস্ত এবং সিঙ্গাপুরের আর পাঁচটা যানবাহনের মতোই দিব্যি দর্শনধারী। মোলায়েম ঠান্ডা বিরাজ করছে কামরায়। চিটপিটে গরম এই শহরটায় এ যেন বাড়তি পাওনা। আউটরাম পার্কে ট্রেন বদলাতেও সমস্যা হল না। প্ল্যাটফর্মে নিখুঁতভাবে দিক নির্দেশ করা আছে।

লিটল ইন্ডিয়া থেকে আউটরাম পার্ক আসার সময় কামরায় বেশ ভিড় ছিল। সিমেইগামী ট্রেন মোটামুটি ফাঁকা।ভূগর্ভ ছেড়ে মাঝে-মাঝে উপরে উঠে আসছে ট্রেন, একটা-দুটো স্টেশন পরে আবার নেমে যাচ্ছে নীচে। ওঠানামার খেলাটা দেখতে বেশ মজাই লাগছিল টুপুরের। নাইট সাফারিতে না যেতে পারার আক্ষেপ যেন পুষিয়ে যাচ্ছিল। বেচারা বুমবুমটার বোধ হয় এম-আর-টি চড়া হল না।

সিমেই পৌঁছে ছোট্ট একটা ম্যাজিক দেখাল মিতিনমাসি। এসকালেটর বেয়ে নামতেই আবার স্বয়ংক্রিয় টিকিটযন্ত্র। তার ভিতরে কার্ড ঢোকাতেই ঠং করে বেরিয়ে এল একখানা এক ডলারের কয়েন। টুপুরের কার্ডে আবার আর-একটা কয়েন।

টুপুর ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে বলল, "এটা কী করে হল গো?"

"সিঙ্গাপুরকা জাদু," মিতিন ফিকফিক করে হাসছে, "এখানকার এম-আর-টি ভারী মজাদার রে। যতটা নেয়, তার খানিকটা ফিরিয়েও দেয়। আমি লিটল ইন্ডিয়া স্টেশনেই ওয়াচ করেছি।"

"খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু।"

"মোহিত হোস না টুপুর। একটু পরে হয়তো দেখবি অন্য ধরনের কোনও 'ইন্টারেস্টিং' আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।"

॥ ৯ ॥

ইস্ট-এন্ড শপিং মল একেবারে সিমেই স্টেশনের গায়ে। মাঝে শুধু একটা চাতালের ব্যবধান। রীতিমতো মেলা বসে গিয়েছে সেখানে। রঙিন ছাউনি টাঙিয়ে বিক্রি হচ্ছে বাচ্চাদের জামা-কাপড়, খেলনা...আর চাতালের ওপারে যথারীতি সুসজ্জিত পাঁচতলা বাজার।

বিল্ডিংয়ে ঢোকার মুখে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল মিতিন। কোণের ছোট্ট এক রেস্টুরেন্টের সামনে। কাচের ওপর লেখা খাদ্যতালিকা পড়ছে। ঘুরে টুপুরকে বলল, "নতুন খাবার টেস্ট করবি?"

"কী গো?"

"স্কুয়িড খাবি? কিংবা বেবি অক্টোপাস?"

সেন্টোসা দ্বীপের সামুদ্রিক অ্যাকোয়ারিয়ামটা পলকের জন্য টুপুরের চোখে ভেসে উঠল। ঢোক গিলে বলল, "তুমি যদি খাও, তো খাব।"

এক বৃদ্ধা, সম্ভবত ভিয়েতনামি, দোকান চালাচ্ছেন। কথা বলছেন দুর্বোধ্য ইংরিজিতে। ভাষাটা বোধ হয় বোঝেনও না। তাঁকে স্কুয়িড ভাজা আর কোল্ড ড্রিঙ্কসের অর্ডার দিতে গিয়ে মিতিনমাসির গলদঘর্ম দশা। স্রেফ বোঝানো গেল না বলেই বেবি অক্টোপাস চাখার ইচ্ছেটা পরিত্যাগ করতে হল।

চাতালের এদিকটায় ছড়িয়েছিটিয়ে চেয়ার-টেবিল। একখানা দু' চেয়ারের টেবিলে টুপুর আর মিতিন বসল মুখোমুখি। একটু আগেও মিতিন বেশ হাসিখুশি ছিল, হঠাৎই কেমন গম্ভীর। পার্থর ক্যামেরা-মোবাইলখানা ব্যাগ থেকে বের করল। দেখছে কী যেন! ভাবছে।

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "দুম করে তোমার মুড চেঞ্জ হয়ে গেল যে?"

মিতিন ঘড়ি দেখে বলল, "তাড়াতাড়ি স্কুয়িড ভাজাটা খেয়েই উঠতে হবে। সময় নষ্ট করা যাবে না।"

"আহা, খেতে তো তুমিই চাইলে। আমি নাকি?"

"হুঁ, ভুল হয়ে গেল। ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট এজেন্সি বন্ধ না হয়ে যায়!"

কথার মাঝেই এসে গিয়েছে প্লেট। সঙ্গে সসের বোতল। মিতিনমাসির দেখাদেখি স্কুয়িড ভাজায় কামড় বসাল টুপুর। যতটা বিটকেল হবে বলে সে ধরে নিয়েছিল, মোটেই সেরকম নয়। ঝালমশলা দিয়ে মুচমুচে করে ভাজা দ্রব্যটি মাংসর পেঁয়াজির মতো। খুব একটা উৎকট গন্ধ নেই। মন্দ লাগে না খেতে। মাঝে-মাঝে কোল্ড ড্রিঙ্কে চুমুক দিয়ে নিলে আরও যেন জমে যায়।

ঝটিতি প্লেট গ্লাস সাফ করে মাসি-বোনঝি ইস্ট-এন্ড মলের অন্দরে। মধ্যিখানের গোল জায়গাটায় মঞ্চ বানিয়ে রবিবারের নাচাগানা চলছে। জাপানি চেহারার একটি মেয়ে দারুণ সেজেগুজে খুব আবেগ দিয়ে গান গাইছিল। হঠাৎ গলা চড়িয়েছে সোপ্রানোয়। তুমুল হাততালি দিচ্ছে শ্রোতারা।

গান শুনতে-শুনতে ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট খোঁজা চলছিল। মিলেও গেল অবিলম্বে। এসকালেটরকে পাক খেয়ে ঢুকে গিয়েছে প্যাসেজ, তারই শেষ প্রান্তে।

কাচের দরজা ঠেলে মিতিন আর টুপুর ভিতরে ঢুকে দ্রুত চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। দেওয়ালে নানা শহরের ছবি। জাকর্তা, ব্যাঙ্কক, কোয়ালালামপুর, টোকিও, মেলবোর্ন, সিডনি... কাউন্টারের ওপারে এক তামিল যুবক। পরনে সাদা শার্ট, কালো-স্ট্রাইপ্‌ড সুট, নেভি-ব্লু টাই। সামনে কম্পিউটার।

উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে যুবকটি বলল, "আপনাদের কীভাবে সাহায্য করতে পারি ম্যাডাম?"

"এখান থেকে কি গাড়ি ভাড়া পাওয়া যাবে?" মিতিন কায়দা করে ইংরেজিতে কথা শুরু করল, "সিঙ্গাপুর ঘোরার জন্য?"

"নিশ্চয়ই।"

"আমি একটা মিৎসুবিশি গাড়ি চাইছি। সাদা।"

লোকটা পলকের জন্য থমকে থেকে বলল, "দেখতে হবে ফ্রি আছে কিনা।"

"তার মানে আপনাদের একটা সাদা মিৎসুবিশি আছে?

"হ্যাঁ। কেন বলুন তো?"

"আপনাদের এখান থেকেই ভাড়া করা সাদা মিৎসুবিশি নিয়ে এক ভদ্রলোক চাংগি এয়ারপোর্টে আমাদের রিসিভ করতে গিয়েছিলেন..." মিতিন সহসা স্বর পালটে ফেলল, "আমি সেই ভদ্রলোককে খুঁজছি।"

যুবকটির চোখমুখ কুঁচকে গেল। ঈষৎ রুক্ষ গলায় বলল, "আপনারা ঠিক কী জন্যে এসেছেন, বলুন তো? গাড়ি ভাড়া করতে? না সেই ভদ্রলোকের সন্ধানে?"

"ধরে নিন, দুটোই। তবে ভদ্রলোককে আগে দরকার।"

"আপনার কাছে ভদ্রলোকের সেলফোন নম্বর নেই?"

"আছে। তবে রেসপন্স পাচ্ছি না। সুইচড অফ।"

"তা হলে তো কিছু করার নেই। এনি ওয়ে, আপনার কবে গাড়ি চাই?"

প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে মিতিন বলল, "আচ্ছা, যিনি গাড়িটা নিয়েছিলেন, তাঁর ঠিকানা নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে আছে?"

"সরি ম্যাডাম। কাস্টমারদের অ্যাড্রেস জানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"উনি কিন্তু পেটি কাস্টমার নন। একটা কোম্পানির প্রতিনিধি। পেঙ্গুইন রিসর্ট্স ইন্টারন্যাশনাল। ওঁদের এখানকার অফিসের অ্যাড্রেসটা দিলেও চলবে।"

"সরি ম্যাডাম। নিয়ম নেই।"

"তা হলে আর কী উপায়ে ভদ্রলোককে ট্রেস করা যায়, বলুন তো?" মিতিন ঝট করে মোবাইলের একটা ছবি মনিটরে এনে সেটটা বাড়িয়ে দিল। ভারী গলায় বলল, "দেখুন তো, এই ভদ্রলোকই গাড়ি নিয়েছিলেন কি না?"

খুদে পরদায় মিস্টার নারায়ণ। সাদা মিৎসুবিশির বনেটের সামনে। মুখ সামান্য ফেরানো, তবে চিনতে অসুবিধে নেই।

ছবিটা দেখে যুবকের চোখের মণি যেন পলকের জন্য চঞ্চল। পরক্ষণে স্বাভাবিক। মাথা নেড়ে বলল, "উঁহু, চিনতে পারছি না।"

"সে কী? উনি রেগুলার এখান থেকে গাড়ি নেন!"

"তাই বলেছেন নাকি?"

"নইলে জানব কোত্থেকে?"

দু'-এক সেকেন্ড থেমে থেকে যুবকটি বলল, "শুনুন, একটা কথা বলি। আমাদের বেশিরভাগ কাস্টমারই ইন্টারনেটের মাধ্যমে গাড়ির দরকারের কথা জানান। নেটেই পেমেন্ট আসে। আমরা গাড়ি পাঠিয়ে দিই।"

"তার মানে আপনি ভদ্রলোককে কখনওই দেখেননি?"

"মনে করতে পারছি না।"

"ও। ফোটোগ্রাফটা সিঙ্গাপুর পুলিশকে দিলে নিশ্চয়ই ভদ্রলোকের সন্ধান পাওয়া যাবে?"

"আপনার সমস্যাটা মনে হচ্ছে খুব গভীর? কেন ভদ্রলোককে এত খুঁজছেন, জানতে পারি?"

"উনি আমাদের পরিবারকে যথেষ্ট উত্ত্যক্ত করেছেন। ওঁকে একটু সহবত শেখাতে চাই।"

"আমার একটা পরামর্শ শুনবেন? মিছিমিছি ঝামেলায় যাবেন না।" যুবক প্রায় বিনয়ের অবতার বনে গেল, "দেখুন না, এক সময় না এক সময় মোবাইলে পেয়ে যাবেন। তখন যা বলার বলে দেবেন। ... মনে তো হচ্ছে আপনারা টুরিস্ট। বেড়াতে এসে খামোকা পুলিশের হাঙ্গামায় কেন জড়াবেন? মাঝখান থেকে ফেরাটাও হয়তো আটকে যাবে।"

"বলছেন?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম," টুরিস্টরা এখানে এসে অশান্তিতে পড়ুক, এটা মোটেই কাম্য নয়। পুলিশ-টুলিশের ভাবনা বরং মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন।"

"দেখি...আপনি তো পেঙ্গুইন রিসর্ট্স ইন্টারন্যাশনালের অ্যাড্রেসটাও দিচ্ছেন না। পেলে ওখানেই ভদ্রলোকের নামে কমপ্লেন ঠুকতাম..."

"বললাম তো, সরি। আমরা হেল্পলেস। ...একটা কাজ করুন না ম্যাডাম। আপনার অভিযোগ লিখিতভাবে এখানে দিয়ে যান। আমরা ওদের লোকাল অফিসে পাঠিয়ে দেব।"

"পেঙ্গুইনের সিঙ্গাপুর অফিসটা যে লোকাল অফিস, এটা আপনি জানেন?"

আবার একটু থমকাল স্ট্রাইপ্‌ড সুট। পরমুহূর্তে সামলে নিয়ে

বলল, "না মানে...অফিসটা তো এখানে, তাই লোকাল শব্দটা ব্যবহার করেছি।"

"ও," মিতিন মাথা দোলাল, "আপনাদের মালিক তো মিস্টার টি পি শঙ্করন। তাই না?"

যুবকের চোখের মণি এবার স্থির। যেন মিতিনমাসির ভিতরটা পর্যন্ত পড়তে চাইছে। চাউনিটা একদমই ভাল লাগল না টুপুরের। কী ভীষণ শীতল! ঠিক যেন সেন্টোসায় দেখা হাঙরটার মতো।

স্বরে এতটুকু উত্তেজনা না এনে অসম্ভব ঠান্ডা গলায় যুবকটি বলল, "মালিকের নাম জেনে আপনার কী হবে?"

"আমি তাঁকে একটু মিট করতে চাই।"

"উনি এখন সিঙ্গাপুরে নেই। ব্যাঙ্কক গিয়েছেন। সাতদিন পরে ফিরবেন।"

"উনি...মানে মিস্টার শঙ্করন তো?"

দৃষ্টি আবার স্থির। আবার সেই একই রকম হিমেল গলা, "আপনি প্লিজ় এখন আসুন ম্যাডাম। আমার হাতে কাজ আছে। অফিস বন্ধ করারও টাইম হয়ে এল।"

তাও একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে এল মিতিন। টুপুরকে নিয়ে হাঁটছে সিমেই স্টেশনের দিকে। যেতে-যেতে টুপুর জিজ্ঞেস করল, "কী বুঝলে গো মিতিনমাসি?"

"ছোকরা মহা ধড়িবাজ। পাঁকাল মাছ। পিছলে-পিছলে যায়।"

"ওকে অত প্রশ্ন করছিলেই বা কেন? মিস্টার নারায়ণ কিংবা পেঙ্গুইনের ঠিকানা জেনে তুমি কী করবে?"

"জ্ঞানভাণ্ডার পুষ্ট করব।"

"তুমি কি সত্যি-সত্যি মিস্টার নারায়ণকে ফোন করেছিলে?"

"হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ। আমি সব সময় গুল মারি নাকি?"

"লাইন পাওনি?"

"রিং হচ্ছে বারচারেক, তারপর ভয়েস রেকর্ডারে চলে যাচ্ছে।"

"স্ট্রেঞ্জ! কাল হোটেলে এসে বসে রইলেন, পরে আবার ফোন করলেন...অথচ আজ যোগাযোগ রাখতে চাইলেন না? টুপুর বিস্মিত, এসব কাণ্ড কেন ঘটছে, মিতিনমাসি? কেন উনি এরকম করছেন?"

"ধূম্রজাল। কুজ্ঝটিকা," মিতিন হালকা হাসল, "চল চল, ট্রেন ধরি।"

টিকিটমেশিন থেকে কার্ড নিয়ে দু'জনে ঢুকল প্ল্যাটফর্মে। এবার সঙ্গে-সঙ্গে ট্রেন নেই, মিনিটপাঁচেক দাঁড়াতে হল। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল টুপুর। হঠাৎই এক জায়গায় চোখ আটকেছে। ফিসফিস করে বলল, "মিতিনমাসি, ওই ছেলেটাকে দ্যাখো।"

কালো টি-শার্ট আর জিন্‌স পরা তাগড়াই চেহারার মালয়ী যুবকটার দিকে মিতিন তাকালই না। নিচু গলায় বলল, "চোখ সরিয়ে নে। ও ইস্ট-এন্ড মল থেকে আমাদের ফলো করে আসছে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ রে ভেবলু। সম্ভবত তোর মেসোর মোবাইলটা হাতাতে চায়।ওর ডান হাত যেভাবে পকেটে গোঁজা, আর্মস থাকাটাও বিচিত্র নয়।"

"সর্বনাশ! কী হবে তা হলে?"

উত্তর দেওয়ার আগেই স্টেশনে ট্রেন। দরজা খুলতেই উঠে পড়ল মিতিন আর টুপুর। ছেলেটা এখনও প্ল্যাটফর্মে। গেট বন্ধ হওয়ার ঘোষণা হচ্ছে। হঠাৎই ত্বরিত পায়ে এগিয়ে এল।

টুপুর দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে। কামরায় সবে একটা পা রেখেছে ছেলেটা, আচমকা এক আজব ঘটনা ঘটে গেল। কোত্থেকে অন্য একটা লোক প্রায় ছুটে এসে ধাক্কা মেরে তাকে সরিয়ে সুড়ুৎ করে গলে এল দরজা দিয়ে। ছেলেটা ছিটকে পড়ে রইল প্ল্যাটফর্মে। ট্রেন ছেড়ে দিল।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে গিয়েও টুপুরের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছে। এক ঝটকায় ছেলেটাকে ফেলে দিয়ে কামরায় ওঠা লোকটা আর কেউ নয়, সেন্টোসার সেই ফ্রেঞ্চকাট স্বয়ং! টুপুর প্রমাদ গুনল। তাকাল মিতিনমাসির দিকে। না জানি কী ভয়ংকর মতলবে ফের পিছু নিচ্ছে লোকটা!

মিতিন নির্বিকার। টুপুরকে স্তম্ভিত করে হঠাৎই এগিয়ে গেল লোকটার কাছে। সপ্রতিভ স্বরে শুদ্ধ বাংলায় বলল, "অনেক ধন্যবাদ মিস্টার দত্ত। ছেলেটা যথেষ্ট বিপজ্জনক ছিল।"

"জানি তো। কিন্তু আপনি আমায় চিনে ফেললেন?"

"ছদ্মবেশ ধরাটা যেমন আপনার কাজ, ছদ্মবেশের আড়ালের মানুষটাকে খুঁজে বের করাটা আমার কাজ," মিতিন ব্যাগ খুলে নিজের পরিচয়জ্ঞাপক কার্ড বের করে দিল। গলা নামিয়ে বলল, "আপনি কিন্তু নাকখানা আনইউজুয়ালি লম্বা করে ফেলেছেন।"

সুজিত দত্ত শেষ বাক্যটি যেন শুনেও শুনলেন না। কার্ডে চোখ রেখে বললেন, "ও। আপনি তা হলে...?"

"সোজা বাংলায় টিকটিকি," মিতিন ঠোঁট টিপে হাসল, "আপনি কি কার্লটন হোটেল ছেড়ে এখন সিমেইতে আছেন?"

"বাধ্য হয়েছি উঠতে। বেশিক্ষণ সিমেই-এর বাইরে থাকা চলবে না। পয়া লেবর স্টেশনে নেমে ফিরে যাব।"

"আপনার ফোন নম্বরটা পেতে পারি কি?"

"আপনার মোবাইলে আমি মিস্‌ড কল দিয়ে দেব।"

পয়া লেবর এসে গিয়েছে। নেমে গেলেন সুজিত দত্ত। টুপুর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না। এদিকে কৌতূহলে পেট ফুলছে। চোখ বড়-বড় করে জিজ্ঞেস করল, "সুজিত দত্ত আসলে কে?"

মিতিন হাসি-হাসি মুখে বলল, "গিরগিটি।"

॥ ১০ ॥

টুপুর শুয়ে ছিল। রুমে ফেরার পর থেকেই মিতিন ঠায় বসে আছে ব্যালকনিতে। একেবারে ধ্যানস্থ যেন। তার কাছে বারকয়েক গিয়েছিল টুপুর। প্রশ্নও করেছে একের পর এক। কিন্তু হুঁ, হ্যাঁ-এর বেশি জবাব পায়নি। কিংবা, 'কষছি তো অঙ্কটা, মিললে বলব' ধরনের উত্তর। টুপুরের নিজের মাথাতেও ঘুরপাক খাচ্ছে ধাঁধা। টিভিতেও তাই মন বসছিল না। অগত্যা বিছানায় গড়াগড়ি খাওয়া ছাড়া উপায় কী!

বুমবুম আর পার্থ ফিরল রাত দশটা বাজিয়ে। রাতের চিড়িয়াখানা দেখে বুমবুমের প্রাণে উচ্ছ্বাসের বান ডেকেছে। ঘরে ঢুকেই গলায় উদ্ভট শব্দ করতে-করতে লাফাল খানিকক্ষণ। ওটা নাকি আফ্রিকান নাচ। লাঠি বল্লম নিয়ে, আফ্রিকার আদিবাসী সেজে, মাদল গোছের বাজনা বাজিয়ে, কিছু সিঙ্গাপুরি যুবক নাকি এরকমই লম্ফঝম্ফ করছিল চিড়িয়াখানায়। আগুন খাওয়া, আর মুখ দিয়ে আগুন উগরে দেওয়া...এটা অবশ্য দেখাতে পারল না বুমবুম। হোটেলের ঘরে আগুন জ্বালানো নিষেধ কিনা!

বর্ণনাও চলছে সবিস্তার, "বুঝলি দিদি, সে এক অন্ধকার ফরেস্ট। আমরা ট্রামে চেপে যাচ্ছি, আর হঠাৎ-হঠাৎ দেখছি টাইগার দাঁড়িয়ে আছে, লায়ন হাই তুলছে...! রাইনো, ভল্লুক, হিপো, হাতি, বাইসন, হরিণ, বাঁদর, সব দেখতে পেলাম।

টুপুর চোখ ঘুরিয়ে বলল, "অন্ধকারে এত জন্তু দেখতে পেলি?"

"অ্যানিম্যালদের ওখানে আলো ছিল তো। দেখা যাচ্ছিল তো। সব অ্যানিম্যাল ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছিল।"

"কাছ থেকে দেখলি? না দূর থেকে?"

"একদম কাছ থেকে। ওনলি টেন ফিট।"

বুমবুমের একটু বাড়িয়ে বলার অভ্যেস আছে। টুপুরের বিশ্বাস হচ্ছিল না। পার্থকে জিজ্ঞেস করল, "সত্যি নাকি গো মেসো?"

পার্থ বলল, "আধা সত্যি। হরিণটরিনগুলো কাছাকাছি ছিল। তবে বাঘ-সিংহ অনেকটাই তফাতে। মাঝে পরিখা। এমনভাবে ফোকাস মেরে রেখেছে, জন্তুগুলোকে দেখা যাবেই। তবে জঙ্গলটা স্রেফ চালাকি। এমনভাবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ওরা নিয়ে যায়, মনে হবে তুই বোধ হয় আমাজনের জঙ্গলে ঢুকে পড়লি। অথচ পাঁচ-সাত মিনিট পর যেখানে থামছে, সেখানে দিব্যি স্ন্যাক বার, টয়লেট... তবে সব মিলিয়ে বেশ একটা নাইট সাফারির গা ছমছম করা এফেক্ট আছে কিন্তু।"

"আর ওই শো'-টার কথা বলো," বুমবুম ঝাঁপিয়ে পড়ল, "একটা প্রকাণ্ড কাঠবেড়ালি কেমন সুড়সুড় করে দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে গেল! আর দুটো লোক গায়ে পাইথন জড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একটা বেজি তো কানে-কানে কথা বলছিল ট্রেনারের সঙ্গে।"

"তার মানে তোরা খুব এনজয় করেছিস?"

পার্থ বলল, "এনজয় করার মতোই জায়গা রে। ঢোকার মুখে মশালটশাল জ্বলছে, ভুরভুর করে খাবারের গন্ধ বেরোচ্ছে, অথচ কয়েক পা গেলেই অরণ্যের হাতছানি... একটাই যা চোখে লাগে, জন্তুগুলো বড্ড আড়ষ্ট। দেখে মনে হয়, ওই ভাবে শো না দিলে ওদের গর্দান যাবে।"

আপনমনে বলেই চলেছে পার্থ। কী রকম ভিড় ছিল আজ নাইট সাফারিতে, কত দেশের কত ধরনের মানুষ এসেছিল, সরু-সরু

রহস্যময় পথে সে আর বুমবুম অন্ধকারে কেমন হেঁটে বেড়িয়েছে, ওখানকার কর্মচারীদের ব্যবহার কত মধুর, এই সব। বলতে-বলতে হঠাৎই তার মনে হল মিতিন যেন বড় বেশি ভাবলেশহীন।

থমকে গিয়ে পার্থ জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার, তুমি এত চুপচাপ কেন? এখনও সেই কিছু না চুরি হওয়ার রহস্য নিয়ে ভেবে চলেছ?"

পার্থ বুমবুম ফেরার পর ঘরে এসেছে মিতিন। বসেছিল টুলে। আলগাভাবে বলল, "না তো, শুনছি তো।"

"সন্ধেটা হোটেলেই কাটালে?"

"বেরিয়েছিলাম একটু। সিঙ্গাপুরের এম-আর-টি চড়ে এলাম।"

"যাক। টুপুরের সন্ধেটা তা হলে একেবারে শুখা যায়নি।"

টুপুর হাসল মৃদু। তাদের সান্ধ্য অভিযান আর সুজিত দত্তর প্রসঙ্গ তো এখনই তোলার জো নেই। মিতিনমাসি পইপই করে বারণ করেছে বলতে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "তোমরাও কাল সকালে চড়ে নিতে পার। বুমবুমের খুব ভাল লাগবে।"

পার্থ বলল, "দেখি, যদি সময় পাই। ওদিকে তো আবার তোদের শপিংটপিংও আছে।"

"ঠিক বলেছ। দু'খানা পারফিউম আমায় কিনতেই হবে। মা কাকে যেন দেবেন।"

"আমিও তো একটা ডিজিটাল ক্যামেরা দেখব।"

বুমবুম চেঁচিয়ে উঠল, "আর আমার ভিডিয়ো গেম্‌স?"

"হবে, হবে। সব হবে," পার্থ পেটে হাত বোলাল, "কিন্তু এখন যে একটু খিদে-খিদে পাচ্ছে। পেটে একটু দানাপানি ফেলতে হয়।"

মিতিন নিজের মোবাইলটা টেপাটেপি করছিল। চোখ তুলে বলল, "কেন, তোমরা খেয়ে আসোনি?"

"নাইট সাফারিতে ঢোকার সময় খেয়েছিলাম। বার্গার আর চিকেন নাগেট্‌স।"

"আর ভিতরেও যে খেলে?" বুমবুম ফুট কাটল, "শিক কাবাব, স্যান্ডউইচ..."

"সে তো জঙ্গলে হেঁটে কখন হজম হয়ে গিয়েছে।"

মিতিন বলল, "তা হলে চলো, আমাদের সঙ্গে আর-একপ্রস্থ সাঁটাবে।"

মুখে খাইখাই করল বটে, ডাইনিং হলে গিয়ে পার্থ অবশ্য বিশেষ কিছু নিল না। একবাটি থাই সুপ আর টুপুরের প্লেট থেকে একটুখানি ফ্রায়েড রাইস, ব্যস। বুমবুম শুধু আইসক্রিম।

খাওয়া শেষ করে মিতিন উঠে দাঁড়াল। ঘড়ি দেখতে-দেখতে বলল, "তোমরা বিল মিটিয়ে রুমে যাও। আমি একটু আসছি।"

পার্থ বিস্মিত স্বরে বলল, "এত রাতে কোথায় যাবে?"

একটা অর্থপূর্ণ হাসি ছুড়ে দিয়ে ব্যাগ কাঁধে বেরিয়ে গেল মিতিন।

বুমবুমের দৌড় শেষ, রুমে এসেই শয্যা নিয়েছে। পার্থ ঢুকল স্নানে। কাল দু'বার স্নান করেছিল সে, আজ এই নিয়ে তৃতীয় বার। এখানকার গরমে তার নাকি সারাক্ষণ চিড়িয়াখানার জলহস্তীদের মতো জলে গলা ডুবিয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে।

বেশ খোশমেজাজে বাথরুম থেকে বেরোল পার্থ। গুনগুন গান গাইছে। চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে টুপুরকে বলল, দুটো-তিনটে ইন্টারেস্টিং সাইট কিন্তু আমাদের দেখা বাকি, বুঝলি। তোর মাসির মুড ঠিকঠাক থাকলে কাল ভোরেই বেরিয়ে পড়া যায়।

টিভির রিমোট টিপে-টিপে এ চ্যানেল-ও চ্যানেল ঘুরে বেড়াচ্ছিল টুপুর। জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবে?"

"যেমন ধর, নেতাজির যদি কোনও মেমোরিয়াল থাকে, সেখানে তো একবার যাওয়া উচিত।"

"তেমন আছে নাকি কিছু?"

"এদের টুরিং-লিফলেটগুলোতে তো সেভাবে দেখছি না। তবে

আমি যদ্দুর জানি, একটা ওয়ার-মেমোরিয়াল এখানে আছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের স্মৃতিতে।"

"রাসবিহারী বসু এই সিঙ্গাপুরেই তো নেতাজির হাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভার তুলে দিয়েছিলেন। তাই না?"

"হুঁ... তারপর ধর, এখানকার পোর্টের দিকে যেতে পারি। কিংবা বোটানিকাল গার্ডেন।"

"ওসব বোধ হয় এবার আর হল না গো। কাল কেনাকাটা আছে, গোছগাছ আছে, সন্ধের মধ্যে এয়ারপোর্ট পৌঁছতে হবে..."

"সত্যি, টুরটা খুবই ছোট হল। ব্যাটারা যদি ফাইভ ডেজ় ফোর নাইট্স দিত, দিব্যি ধীরেসুস্থে ঘোরা যেত। বলতে-বলতে পার্থর যেন একটা দরকারি কথা মনে পড়ে গিয়েছে। ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল, "হ্যাঁ রে, তোর মাসি যে আমার হ্যান্ডিক্যাম আর মোবাইল ফোনটা আটকে রাখল... কী করল রে ও দুটো নিয়ে?"

"সেন্টোসার ক্যাসেটটাই আবার দেখছিল।"

"সেই অনুসরণকারীর ভূত এখনও ঘাড় থেকে নামেনি?... তা দেখে লাভ হল কিছু?"

টুপুর ফাঁপরে পড়ল। কী বলবে, কতটুকু বলবে, ভেবে পাচ্ছিল না। পার্থমেসোর প্রশ্ন কোত্থেকে কোথায় ঠেলে নিয়ে যায় তার ঠিক কী।

সাজিয়েগুছিয়ে অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ ধরনের একটা জবাব খাড়া করছিল টুপুর, মিতিন ফিরেছে। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পালটে টুপুর বলে উঠল, "এতক্ষণ কোথায় ঘুরছিলে?"

খাটে বসে মিতিন বলল, "হাঁটতে-হাঁটতে একটু মুস্তাফা সেন্টারে গিয়েছিলাম।"

পার্থর চোখ গোল-গোল, "মাঝরাতে মুস্তাফা?"

"বা রে, তুমি তো বলছিলে সারা রাত খোলা থাকে। সেটাই একবার পরখ করে এলাম।"

টুপুর আহত মুখে বলল, "একাই গেলে? আমাদের ফেলে?"

"তোরা কাল যাস। তখন নয় আমি ঘরে থাকব।"

"শুধুই দেখতে গিয়েছিলে?" পার্থর তেরচা প্রশ্ন, "নাকি কিছু কিনলেটিনলে?"

"সামান্য কিছু। আমার গয়নাগাটি।"

"দেখাও।"

"দেখবে?" ব্যাগ খুলে একটা ম্যাগনিফায়িং গ্লাস বের করল মিতিন। হেসে বলল, "ডিটেকটিভের কাছে এটাই গয়না।"

পার্থ মুখ বাঁকাল, "বাড়িতে তো খানচারেক আছে। আবার আর-একটা?"

"থাক। সিঙ্গাপুরের স্মৃতিচিহ্ন," মিতিন কোলে বালিশ টানল, "যাক গে, জরুরি কথা শোনো। কাল সকালে তোমায় একটা কাজ করতে হবে।"

"ক'টার সময়?"

"সাতটার মধ্যে। বাবুর ঘুম ভাঙবে তো?"

"হুকুম করলে বান্দা সারারাত জেগে থাকবে। লেকিন কাম কেয়া হ্যায়?"

"একটা ই-মেল পাঠাবে। পেঙ্গুইন রিসর্ট্স ইন্টারন্যাশনালে।"

"তাদের আবার কী লিখব?"

"বয়ান মোটামুটি বলে দিচ্ছি। তুমি ইংরেজি করে নিয়ো। একটা চমৎকার সিঙ্গাপুর ভ্রমণ উপহার দেওয়ার জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। তবে আমাদের পক্ষ থেকে একটি অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ঘটে গিয়েছে। আপনাদের প্রতিনিধি মিস্টার কে এস এস নারায়ণকে মূল আমন্ত্রণপত্রটির বদলে ভুল করে তার একটা কপি দিয়েছিলাম। মিস্টার নারায়ণ বারবার মূল চিঠিটি চাওয়া সত্ত্বেও আমি তাঁকে সেটা দিতে পারিনি। কারণ চিঠিটা তখন খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পরে, কাল

দুপুরে, আমার স্ত্রীর হাতব্যাগের খাঁজে সেটি হঠাৎই আবিষ্কৃত হয়। তারপর থেকে...”

“অ্যাই, দাঁড়াও দাঁড়াও,” পার্থ হাত তুলে মিতিনকে থামাল, “তুমি সত্যি চিঠিটা পেয়েছ নাকি?”

“নয় তো কি বানিয়ে বলছি?”

“তোমার ভ্যানিটিব্যাগেই ছিল?”

“তাই তো দেখছি।”

“কিন্তু..তোমার ব্যাগে গেল কী করে?”

“নিশ্চয়ই তুমিই রাখতে দিয়েছিলে। তারপর তোমারও স্মরণে আমারও না,” অম্লানবদনে মিতিন ফের খেই ধরল, “যাক গে, রপর লিখবে, চিঠিটা পেয়েই তুমি মিস্টার নারায়ণের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়েছ। কিন্তু মিস্টার নারায়ণ সম্ভবত তোমার কোনও আচরণে আহত হয়েছিলেন, এবং হয়তো সেই কারণেই কাল সারা দিনে একটিবারও তিনি তোমার ফোন ধরেননি।”

“এ কী? আমি তো মিস্টার নারায়ণকে ফোন করিনি!”

“করেছ। ভুলে গিয়েছ।”

“বুঝলাম...তারপর?”

“তারপর লিখবে, যেহেতু মূল আমন্ত্রণপত্রটি জমা দিতে তুমি দায়বদ্ধ, তাই তোমার স্ত্রী দায়িত্বটি নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। মিস্টার নারায়ণ যে গাড়িটি চাংগি বিমানবন্দরে নিয়ে গিয়েছিলেন, তার নম্বরটি তোমার স্ত্রীর স্মরণে ছিল, সে ইন্টারনেটের মাধ্যমে গাড়ির মালিক ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট ট্র্যাভেল এজেন্সির নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করে ফ্যালে। এবং মিস্টার নারায়ণের সন্ধানে তাদের সিমেই অফিসে সোজা চলে যায়।”

“তো-তো-তোমরা সিমেই গিয়েছিলে?”

“হ্যাঁ। সন্ধেটা নষ্ট করিনি।”

"সিমেই জায়গাটা কোথায়?"

"শহরের পূর্ব প্রান্তে। এয়ারপোর্টের কাছাকাছি," মিতিন এবার মৃদু ধমক দিল, "কথার মাঝে বারবার ব্যাগড়া দিয়ো না তো! আমাকে তা হলে আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে।"

"না না, আমার মনে আছে। সুডোকু করা ব্রেন তো, একবার শুনলেই মুখস্থ হয়ে যায়। তুমি শেষ করো।"

"হ্যাঁ...এবার লিখবে...দুর্ভাগ্যবশত, ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্টের কর্মচারীটি, মিস্টার নারায়ণ কিংবা আপনাদের ঠিকানা দিতে অস্বীকার করে। মিস্টার নারায়ণের একটি ছবি আমার মোবাইলে ছিল, সেটি দেখেও মিস্টার নারায়ণকে সে চিনতে পারে না। উপায়ান্তর না দেখে আমি স্থির করেছি, কলকাতায় ফিরে চিঠিটি আপনাদের কোনও প্রতিনিধির হাতে প্রত্যর্পণ করব। সিঙ্গাপুরেই চিঠিটি আপনাদের দিয়ে দিতে পারলে ভাল লাগত। কিন্তু আজ আর মিস্টার নারায়ণকে খুঁজে বেড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সকালে কিছু কেনাকাটা করার আছে, তারপর দুপুরবেলাটা আমরা বিশ্রাম আর গোছগাছের কাজে ব্যস্ত থাকব। আশা করি, কলকাতায় গিয়ে চিঠিটা দিলে আপনাদের কোনও অসুবিধে হবে না। শেষে ওঁদের অসুবিধে ঘটানোর জন্য আর একবার দুঃখ প্রকাশ করবে। ঠিক আছে?"

"তা আছে," পার্থ নাক কুঁচকোল, "কিন্তু তুমি চিঠিটা দেওয়ার জন্য হঠাৎ এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন?"

"ইনভিটেশন লেটারে সেরকমই কিন্তু লেখা ছিল।"

"জানি তো। তবে ব্যাপারটা তো চুকেই গিয়েছে।"

"তা হোক। পেয়ে যখন গিয়েছি, দেব না কেন?" মিতিনের ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি, "মিছিমিছি একটা অনুচিত কাজ করা তো ঠিক নয়।"

"তার জন্য এত বড় একটা ই-মেল লেখার দরকার কী? নারায়ণকে একটা এস-এম-এস ঝেড়ে দিলেই তো হয়। গট অরিজিনাল। কাম অ্যান্ড টেক। ব্যাটা রাগটাগ ভুলে সুড়সুড়িয়ে এসে নিয়ে যাবে।"

"না। ই-মেলই কোরো," মিতিনের হাসি চওড়া হয়েছে, "মিস্টার নারায়ণের ওই শুঁটকো মুখ আর দেখতে ইচ্ছে করছে না।"

"কী জানি বাবা, তোমার মনে কী প্যাঁচ!" পার্থ হাই তুলল, "সকালে ডেকে দিয়ো। কাজ হয়ে যাবে।"

"চিঠির বয়ানে যেন গড়বড় না হয়। যা-যা বলেছি, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যেন লেখা হয়।"

"হবে।"

টুপুর চুপটি করে মাসি-মেসোর কথোপকথন শুনছিল। ছেঁড়া-ছেঁড়া কয়েকটা সুতো দেখতে পাচ্ছিল শুধু, কিন্তু কিছুতেই সেগুলো জুড়তে পারছিল না। টের পাচ্ছে, একটা কোনও বড়সড় পরিকল্পনা আছে মিতিনমাসির। অথচ তার চেহারা এখনও ঝাপসা।

নাঃ, মিতিনমাসির চিন্তার গতিপ্রকৃতি আন্দাজ করা টুপুরের কম্মো নয়।

॥ ১১ ॥

সদ্য কেনা ডিজিটাল ক্যামেরায় পটাপট ছবি তুলছিল পার্থ। ব্যালকনিতে বুমবুম আর টুপুরকে দাঁড় করিয়ে শাটার টিপল বারকয়েক। হোটেলরুমে বুমবুমকে নানা ভঙ্গিমায় বসিয়ে পরীক্ষা করল ফ্ল্যাশগান। টুপুর ড্রেসিংটেবিলের সামনে চুল আঁচড়াচ্ছে,

বুমবুম ভেংচাচ্ছে টুপুরকে, চিরুনি উঁচিয়ে ভাইকে মার দেখাল টুপুর ...একের পর এক দৃশ্য বন্দি হচ্ছে ক্যামেরায়। সঙ্গে-সঙ্গে খুদে মনিটরে ছবিগুলো দেখেও নিচ্ছে তিনজনে। মন্তব্য চলছে টুকটাক।

পার্থ প্রসন্ন মেজাজে বলল, "ছবির কোয়ালিটি তো ভালই মনে হচ্ছে।"

টুপুর বলল, "প্রিন্টারটাও একবার টেস্ট করে নাও।"

ক্যামেরার সঙ্গে আস্ত একটা ছবিছাপাই যন্ত্র মুফতে পাওয়া গিয়েছে। সত্যি বলতে কী, প্রিন্টারের লোভেই ক্যামেরার এই মডেলখানা পছন্দ করেছে পার্থ। চকচকে মুখে সে বলল, "এখনই প্যাকিং খুলব? না কলকাতায় গিয়ে?"

"কেমন প্রিন্ট হয় একবার দেখে নেবে না?"

মহা উৎসাহে বাক্সটা সবে হাতে নিয়েছিল পার্থ, মিতিন স্নান সেরে বেরিয়েছে। চোখ পাকিয়ে বলল, "কী ছেলেমানুষি করছ? কোথায় এখন মালপত্র সুটকেসে ভরবে, তা নয়..."

"তুমি বড্ড বেরসিক তো!"

"বেশি রসিক হয়ে কাজ নেই। সাড়ে বারোটা বাজে, চলো, আগে খেয়ে আসি। দুপুরে বুমবুমকে একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে। এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি ফিরতে কত রাত হয় কে জানে!"

টুপুর জিজ্ঞেস করল, "আমরা দমদমে নামছি ক'টায়?"

"সাড়ে দশটা।"

"সে কী গো? মাত্র দেড় ঘণ্টায় পৌঁছে যাব? আসার সময় চার ঘণ্টা লেগেছিল না?" বলেই টুপুর জিভ কাটল, "সরি, সরি। কলকাতার ঘড়ি তো সিঙ্গাপুরের চেয়ে পিছিয়ে।"

"কারেক্ট। দ্রাঘিমারেখা পরিবর্তনের জন্য হারিয়ে যাওয়া আড়াই ঘণ্টা সময়টাকে ফেরত পেতে হবে তো।"

পার্থ নীচে যাওয়ার জন্য তৈরি। বুমবুমও। মা'র দেওয়া লম্বা

তালিকা ধরে সকালে গাদাখানেক কেনাকাটা করেছে টুপুর, মালবোঝাই প্লাস্টিকব্যাগ নিজের সুটকেসের পাশে রেখে সে-ও বেরিয়ে পড়ল রুম ছেড়ে। সব শেষে দরজা বন্ধ করল মিতিন।

বুমবুম লিফ্‌ট চড়তে বেজায় ভালবাসে। তাকে পার্থর সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে মিতিন আর টুপুর সিঁড়ি ধরল। লাউঞ্জ পেরোতে গিয়ে টুপুরের পা আটকে গিয়েছে সহসা। সুজিত দত্ত সোফায় বসে! সেই একই ছদ্মবেশ! তবে নাকের সাইজ় আজ একটু ছোট। সেদিকে মিতিনমাসির দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই চাপা ধমক, "তাকাস না। সোজা হাঁট। খেয়ে তাড়াতাড়ি রুমে ফিরতে হবে।"

"কেন গো? গোছগাছ তো মোটামুটি কমপ্লিট। শুধু যা দু'-চারটে...

"প্রশ্ন নয় মাই ডিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট। এখন শুধু দেখে যাওয়া।"

বিদায়ী মধ্যাহ্নভোজনের এলাহি ব্যবস্থা করেছে পার্থ। চিনা আর ভারতীয় পদ মিলিয়েমিশিয়ে। ইন্ডিয়ান পোলাও আছে, চাইনিজ ফ্রায়েড রাইসও। চিকেন আর চিংড়ির সঙ্গে আছে এক অতিকায় কাঁকড়ার তন্দুর। শেষ পাতে ঢালাও আইসক্রিম। গলা অবধি টইটুম্বুর করে পার্থ যখন টেবিল ছাড়ল, সে রীতিমতো হাঁসফাঁস করছে। টুপুরেরও পেট আইঢাই।

অগত্যা এবার চারজনেই ফিরল লিফ্‌টে। ঘরে এসে পার্থ বলল, "বুমবুমের সঙ্গে আমিও একটু গড়িয়ে নিই?"

"সে সুযোগ পাবে কি?"

"কেন?"

"মন বলছে, এখনই কোনও অতিথি আসবেন।"

"মনকে চুপ করিয়ে রাখো।"

হয়েছে কি হয়নি, অমনি মিতিনের বাক্যকে সত্যি করে দিয়ে দরজায় টকটক।

মিতিনই গিয়ে দরজা খুলেছে। একগাল হেসে বলল, "আরে, মিস্টার নারায়ণ যে! আসুন, আসুন।"

নামটা কানে যেতেই টুপুরের চক্ষুস্থির। পার্থও তড়াক উঠে বসেছে। তার মুখ দিয়ে প্রশ্ন ছিটকে এল, "আপনি? আপনি কোত্থেকে?"

নারায়ণ ধীর পায়ে ঘরে ঢুকলেন। স্বভাবসুলভ বিনয়ী সুরে বললেন, "আসতে বাধ্য হলাম স্যার।"

"মানে?"

"আমাদের হেড অফিসে আপনি মেল করেছিলেন... ওরাই আমায় নির্দেশ পাঠাল। বলল, মিস্টার মুখার্জিরা সিঙ্গাপুর ছাড়ার আগে তাঁদের সঙ্গে মনোমালিন্য মিটিয়ে নাও।"

পার্থ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না না, মনোমালিন্যের কী আছে! জাস্ট একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল মাত্র।"

"একদম ঠিক কথা স্যার। আমিও আপনার কথায় কিছুই মনে করিনি। কাল আর কনট্যাক্ট করতে পারিনি, কারণ এক জাপানি কাপলকে নিয়ে বিশ্রীভাবে ব্যস্ত ছিলাম। মর্নিং টু নাইট ওদের গাইড হয়ে ঘুরতে হচ্ছে। আপনারা মেল না করলেও হোটেল ছাড়ার আগে আমি তো একবার আসতামই।"

মিতিন স্মিতমুখে নারায়ণের কথা শুনছিল। হাত বাড়িয়ে বলল, "দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।"

"থ্যাঙ্কস। সোফায় বসে সুটের পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন নারায়ণ। রুমাল যথাস্থানে রেখে বললেন, "হেড অফিস বলল, অরিজিনাল লেটারটা কলকাতা অবধি আপনাদের ক্যারি করার দরকার নেই। স্বচ্ছন্দে ওটা আমাকে দিয়ে দিতে পারেন।"

পার্থ জিজ্ঞেস করল, "কী মিতিন, ওঁকে দেওয়া যাবে তো?"

"অবশ্যই। উনি কষ্ট করে এসেছেন..." মিতিন ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে পেঙ্গুইন রিসর্ট্‌সের প্যাডে লেখা চিঠিটা বের করল। নারায়ণকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "দেখে নিন, এটাই আসল তো?"

নারায়ণ চোখ বোলালেন, "হ্যাঁ, ঠিক আছে।"

"না না, ভাল করে দেখুন। যদি চান, তো আমার ম্যাগনিফায়িং গ্লাসটাও দিতে পারি। খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে নিন, যা চাইছেন তাই পেলেন কিনা।"

"ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে আমার কী হবে?" নারায়ণের মুখে ফ্যাকাশে হাসি। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "অল রাইট, চলি তা হলে?"

"কিন্তু আপনাকে যে এখনই ছাড়তে ইচ্ছে করছে না মিস্টার নারায়ণ," মিতিনের স্বর সহসা কঠিন, "তা ছাড়া চাইলেও বোধ হয় এখন আর যেতে পারবেন না।"

"মানে?"

"বাইরে আপনার শুভাকাঙ্ক্ষীরা অপেক্ষা করছে যে! সঙ্গীসাথী নিয়ে," বলতে-বলতে মিতিন গিয়ে দরজা খুলেছে, "আপনারা এবার আসতে পারেন স্যার।"

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সুজিত দত্ত ঢুকেছেন ঘরে। সঙ্গে জনাচারেক সিঙ্গাপুরি পুলিশ। বিনা বাক্যব্যয়ে তারা হাতকড়া পরিয়ে দিল নারায়ণকে।

ক্ষণিকের জন্য নারায়ণ হতভম্ব। পরক্ষণে চেঁচিয়ে উঠলেন, "এটা কী হল? এটা কী হল?"

"বুঝতে পারছেন না, মিস্টার নারায়ণ? সরি, মিস্টার শঙ্করন? ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোপন তথ্য পাচার করার অভিযোগে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল। আপনার সিঙ্গাপুরের সহকারীরাও এখন পুলিশের জিম্মায়। ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট ট্র্যাভেল এজেন্সি সিল করে দেওয়া হয়েছে।"

"এটা একেবারেই মিথ্যে অভিযোগ। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র," নারায়ণ আরও গলা চড়ালেন, "আমি একজন নিতান্ত নিরীহ মানুষ। সিঙ্গাপুরে খেটে খেতে এসেছি।"

"আপনি আত্মপক্ষ সমর্থনের ঢের সুযোগ পাবেন, মিস্টার নারায়ণ," এতক্ষণ পর সুজিত দত্ত মুখ খুললেন, "তবে তার আগে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বদেশে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করি। হয়তো জেনে আহ্লাদিত হবেন, আজ একই সঙ্গে দিল্লিতেও আপনার দু'জন কর্মচারী ধরা পড়েছেন। রাজেশ শ্রীবাস্তব। এবং অরুণ মাত্রে। আশা রাখি, তাঁরা আপনার কীর্তিকলাপের বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারবেন।"

যেন জোঁকের মুখে নুন পড়ল। পলকে মিইয়ে গেলেন নারায়ণ। অথবা শঙ্করন। ল্যাগব্যাগে লোকটা প্রায় টলে পড়ে যাচ্ছিলেন, পুলিশ অফিসার তাঁকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এখনও নারায়ণের হাতে ধরা আছে পেঙ্গুইনের সুদৃশ্য চিঠিখানা।

ছোঁ মেরে চিঠিটা নিয়ে নিল মিতিন। নারায়ণ কটমট চোখে ঘুরে দেখলেন তাকে। মিতিন গ্রাহ্য করল না।

বাক্‌রুদ্ধ হয়ে পার্থ এতক্ষণ দেখছিল জমজমাট নাটকখানা। নারায়ণকে বগলদাবা করে পুলিশ রওনা দেওয়ার পর সুজিত দত্ত ছদ্মবেশ ছেড়ে ফেললেন। দেখে পার্থ বিমোহিত। কোনওক্রমে তোতলাতে-তোতলাতে বলল, "ও। আ-আমি তা হলে ভুল করিনি। আপনি ক্রিমিনাল নন। পুলিশের লোক।"

"উঁহু। এক ডিগ্রি উপরে," মিতিন শুধরে দিল, "উনি মিলিটারি।"

"ইয়েস, আমি লেফ্‌টেনান্ট কর্নেল সুজিত দত্ত," পার্থর সঙ্গে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন সুজিত, "এখন আমি

মিলিটারির সিক্রেট সার্ভিসে আছি। একটা অর্গানাইজ়ড গ্যাং বেশ কিছুদিন যাবৎ আমাদের অনেক গোপন খবর বিদেশে পাচার করছিল। খবরগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে নিয়মিত কেনাবেচা হয়। আমাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল, ওই গ্যাং এখন সিঙ্গাপুর থেকেই অপারেশন চালাচ্ছে। কিন্তু তাদের কাজের পদ্ধতি এত সরল এবং এমনই নিখুঁত যে, কিছুতেই আমরা তাদের হাতেনাতে ধরতে পারছিলাম না। আপনার মিসেসের উপস্থিত বুদ্ধির জোরে, কেসটার আজ সমাধান হল।"

কুণ্ঠিত স্বরে মিতিন বলল, "না না, আমার তেমন কৃতিত্ব নেই। নারায়ণ, ওরফে শঙ্করন, যদি কয়েকটা বেসিক ভুল না করতেন, তা হলে হয়তো ব্যাপারটা নিয়ে আমি ভাবতামই না।"

"কী রকম?"

"প্রথমেই আমার খটকা লেগেছিল প্রাইজের ব্যাপারটায়। সাধারণত এ ধরনের বিদেশ ভ্রমণের অফার যারা দেয়, তারা ট্র্যাভেল ভাউচার পাঠায়। তাদের প্রতিনিধি সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে ওয়েট করবে, এটাও যেন কেমন অস্বাভাবিক লেগেছিল আমার। তারপর যখন এয়ারপোর্টে নামলাম, লোকটা তখন আগে থেকেই হাজির ছিল। আমি তাকে নোটিশও করেছি। কিন্তু লোকটা আমাদের নেহাতই বুরবক ভেবে দেরি হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করল। আসলে ও তখন একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আমাদের বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। এই লুকোচুরিটা আমার খটকাটাকে আর-একটু উসকে দেয়," মিতিন গলা ঝেড়ে নিল, "এর পর তো চিঠি-এপিসোড। নারায়ণ অরিজিনাল চিঠির জন্য ছটফট করতে লাগল। আর আমিও শিওর হয়ে গেলাম, ইনভিটেশন লেটারেই কোনও গণ্ডগোল আছে। কিন্তু গড়বড়ের নেচারটা কী বুঝে উঠতে পারছিলাম না। ভাবতে-ভাবতে হঠাৎই মনে হল, পেঙ্গুইন রিসর্ট্স

প্রায় প্রতি সপ্তাহেই তো কোনও না-কোনও ফ্যামিলিকে সিঙ্গাপুরে পাঠায়। এবং নারায়ণ মেটিকুলাসলি তাদের কাছ থেকে একটি চিঠি কালেক্ট করে। তা হলে কি সব চিঠিতেই গণ্ডগোল থাকে? নাকি শুধু আমাদেরটাতেই? ভাবছি... ভাবছি... হঠাৎই মিস্টার দত্ত আমায় খানিকটা সাহায্য করে দিলেন।"

পার্থ অবাক মুখে বলল, "কীভাবে?"

"সেন্টোসায় মিস্টার দত্ত আমাদের ফলো করছিলেন। যদিও তখন আমি মিস্টার দত্তকে ছদ্মবেশে দেখে ঠিক চিনতে পারিনি। এও বুঝিনি, আমি ঠিক যতটা ওঁকে সন্দেহ করছি, উনিও ঠিক ততটাই আমাদের সন্দেহ করছিলেন।"

"হান্ড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট, ম্যাডাম," সুজিত দত্ত হাসলেন, "কারণ আমাদের সোর্স খবর দিয়েছিল, পেঙ্গুইন রিসর্ট্স ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি ভুয়ো কোম্পানি ক্যারিয়ারের মাধ্যমে সিক্রেট ইনফরমেশন চালান করছে। কিন্তু ওই চালান করার পদ্ধতিটা আমরা কিছুতেই ধরতে পারছিলাম না। আপনাদের আগে যাঁরা পেঙ্গুইনের সৌজন্যে সিঙ্গাপুর সফর করে গিয়েছেন, তাঁদের সম্পর্কে ডিটেলে খবর নিয়েছি। তাঁরা সকলেই একেবারে সাদামাটা নিরীহ ফ্যামিলি। বেআইনি কাজকারবার থেকে তাঁরা শত হস্ত দূরে থাকেন। তাই এবার ঠিক করি, যে পরিবারকেই সিঙ্গাপুরে পাঠানো হোক, আমরা খোদ সিঙ্গাপুরেই তাঁদের গতিবিধির উপর নজর রাখব। কার্লটন হোটেলেও আমি সেই উদ্দেশ্যেই উঠেছিলাম।"

"বুঝেছি," পার্থ বলল, "আমার সঙ্গে সারা সন্ধে আড্ডা দিয়ে যখন বুঝলেন আমরা বদ লোক নই, তখন আপনি আমাদের ছাড়ান দিলেন।"

"কিছুটা তাই। বিশেষ করে নারায়ণ চিঠির জন্য ঝুলোঝুলি করার সময় আপনি ফোনে যেভাবে রিঅ্যাক্ট করলেন, তাতে বোঝাই যায় আপনাদের ওই দলের সঙ্গে কোনও যোগ নেই।"

গোমড়া গলায় মিতিন বলল, "এটাই তো নারায়ণের ট্রিক মিস্টার দত্ত। ওরা এমন পরিবারকে বেছে নিয়ে পাঠায়, যারা নিজেদের অজ্ঞাতেই দুষ্কর্মের সহযোগী হয়ে যায়। চিঠিটা পার্থর ব্যাগ থেকে মিসপ্লেস্‌ড না হলে আমরাও তাই হতাম। কিন্তু আমাদের মতো ভুল আগে কেউ করেনি। নারায়ণের কাজও তাই স্মুথলি চলছিল। প্রথম এরকম একটা পরিস্থিতিতে পড়ে নারায়ণ মারাত্মক এক ভুল করে ফ্যালে। কোনও এক অনুচরকে পাঠিয়ে ১০৪ নম্বর ঘরে তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালায়। কার্লটন হোটেলের নিরাপত্তা বেশ ঢিলেঢালা। পেশাদার বজ্জাতদের পক্ষে হোটেলের ঘর খুলে ফেলা আদৌ কোনও সমস্যা নয়। রিসেপশনের মেয়েগুলো তো খেয়ালই করে না, কে আসছে, কে যাচ্ছে। কিন্তু সেদিন আর-একটা ঠোক্কর খেল নারায়ণ। আমরা যে স্রেফ একটু প্রকৃতি দর্শনের জন্য রুম পালটে ফেলব, এটা ওর হিসেবেই ছিল না। ফলে লোকটা আরও খানিকটা এক্সপোজ়ড হয়ে গেল। এবং সঙ্গে-সঙ্গে, হয়তো কিছুটা নার্ভাস হয়েই, আমাদের সঙ্গে যোগাযোগটা ছিঁড়ে ফেলল। এত পাকা মাথা, অথচ এটুকু ওর মগজে আসেনি, এতে মানুষের সন্দেহ আরও গাঢ় হয়।"

"আহা, এর জন্য আপনি নারায়ণকে দোষ দিতে পারেন না," সুজিত দত্ত হাসতে-হাসতে বললেন, "ও বেচারার কারবার একেবারে সাধারণ লোকদের নিয়ে। হঠাৎ তার মধ্যে আস্ত একটা গোয়েন্দা ঢুকে পড়বে, এটা ও আন্দাজ করবে কী করে? তাও মিস্টার মুখার্জি যদি ডিটেকটিভ হতেন... নারায়ণ আগেই সাবধান হয়ে যেত। এবং এই বেড়ানোর অফারটা আপনারা পেতেনই না।"

"বটেই তো। বটেই তো," পার্থ গাল ছড়িয়ে হাসল, "বায়োডেটা পাঠানোর সময় আমার মিসেসের অকুপেশন তো 'গৃহবধূ' লিখেছিলাম। রোজগার-টোজগার করে জানালে যদি ব্যাটারা

অফারটাকে কমিয়ে দেয়! হয়তো হোটেল ভাড়া মাইনাস করে দিল। কিংবা এক পিঠের প্লেনফেয়ার...”

“অজান্তেই মোক্ষম চালটা দিয়েছিলেন মশাই। ওই চালেই নারায়ণের ঘটিবাটি চাঁটি হয়ে গেল,” সুজিত হো-হো হাসছেন। হাসতে হাসতে বললেন, “আপনার ই-মেলের প্ল্যানটাও কিন্তু জব্বর ম্যাডাম। নারায়ণ যে এত সহজে টোপ গিলবে, এটা সত্যিই বিশ্বাস করা কঠিন।”

“লোভ। লোভ। এই চিঠিটার আশা যদি ছেড়ে দিত, তা হলে হয়তো ও বেঁচে যেত। একসময় তো দিয়েওছিল। কিন্তু ই-মেলটা পেতেই আবার লোভটা চাগিয়ে উঠল। একটা চিঠি বেচে ও হয়তো লক্ষ ডলার কামায়। তাই না গুটিগুটি ফের পা বাড়াল।”

অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে কথার পিঠে কথা শুনছিল টুপুর। এবার প্রায় মরিয়া হয়ে বলে ফেলল, “কিন্তু একটা সিম্পল চিঠির কী এমন মহিমা? যার থেকে লক্ষ ডলার ইনকাম হয়?”

মিতিন চিঠিটা বাড়িয়ে দিল, “পড়। পড়ে দ্যাখ।”

আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়ল টুপুর, “তুৎ, এ তো সাধারণ এক আমন্ত্রণলিপি। এর মধ্যে রহস্য কোথায়?”

পার্থও ঝুঁকে দেখছিল চিঠিটা। জিজ্ঞেস করল, “ভাষাতেই কোনও সংকেত আছে, তাই না? উই মানে হয়তো হান্ড্রেড! প্লিজ্‌ড মানে হয়তো ব্যাটেলিয়ান। কিংবা সাবমেরিন।”

“ঘোড়ার মাথা। সাংকেতিক ভাষার অর্থ উদ্ধারের জন্য মিলিটারিতে আলাদা একটা বিভাগ আছে। ঠিক কি না, মিস্টার দত্ত?”

“আছে বইকী। তবে এদের সংকেত পাঠানোর পদ্ধতি একেবারেই নতুন। এই ধরনের কেস আমরা এই প্রথম পেলাম।”

মিতিন বলল, “অথচ ভেবে দেখলে পদ্ধতিটা অতি সিম্পল।

চিঠির ভাষা আপনারা নানানভাবে খতিয়ে দেখবেন। কিন্তু সেখানে কিস্‌সু নেই। চিঠির মাথায়, কোম্পানির প্রতীক পেঙ্গুইনের গায়ে, অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লেখা বসিয়ে নারায়ণ যে সবাইকে বুদ্ধু বানাচ্ছিল, কে-ই বা ধারণা করবে? এভাবে খবর পাচার করাটাকে বলে স্টেগানোগ্রাফি।"

"জানি," সুজিত দত্ত মাথা নাড়লেন, "তবে এভাবে কারিকুরি করে প্রতি সপ্তাহেই যে দেশের বাইরে গোপন খবর চলে যাচ্ছে, এটা অনুমান করা কি সম্ভব? বিশেষ করে সংবাদবাহকরা যেখানে গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে একেবারেই অন্ধকারে?"

"তা ঠিক," মিতিন চিঠিটা নিয়ে সুজিত দত্তর হাতে দিল, "এই চিঠি আপনাদেরই সম্পত্তি। আপনিই রাখুন। তবে নারায়ণের লোকজনের এলেম আছে। চালের উপর আস্ত রামায়ণ লেখার মতো খুদি-খুদি অক্ষরে দিব্যি কেমন লিখে দিয়েছে। ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়েও পরিষ্কার পড়তে পারলাম না। সম্ভবত সিয়াচেন-টিয়াচেন গোছের কিছু লেখা আছে। সঙ্গে কিছু সংখ্যাও। আপনাদের শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপের নীচে নিশ্চয়ই পুরোটা পড়া যাবে।"

মৃদু হাসলেন সুজিত দত্ত। চিঠিটা পকেটে পুরে উঠে দাঁড়ালেন। মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, "আপনাকে আবার একবার ধন্যবাদ জানাই ম্যাডাম। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন।"

"থ্যাঙ্ক ইউ।" মিতিনও মাথা নোওয়াল, "আপনি কি আজকের ফ্লাইটে ফিরছেন?"

"না ম্যাডাম। নারায়ণ আর তার শাগরেদদের দেশে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। প্রচুর ফর্মালিটি আছে। সেনাবাহিনী প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে জানাবে, সেখান থেকে সিঙ্গাপুর সরকারের কাছে অনুরোধ আসবে ...এ এক লম্বা প্রসেস। শেষ পর্যন্ত হয়তো

আমি থাকব না। তবে শুরুটা তো করে যেতে হবে।”

সুজিত দত্ত বেরিয়ে গেলেন। এতক্ষণ গমগম করছিল ঘরটা, হঠাৎই নিশ্চুপ। তখনই টুপুরের নজরে পড়ল, এত কিছু ঘটে গেল, অথচ তার মধ্যেও কী নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে বুমবুম!

টুপুর ঝুঁকে ধাক্কা দিল ভাইকে, “অ্যাই কুম্ভকর্ণ, ওঠ। জাগ।”

পার্থ ফোড়ন কাটল, “উঁহু, কুম্ভকর্ণ নয়। কুম্ভকনম। ঘুমের জালে ধরা পড়েছে।”

॥ ১২ ॥

আবার আকাশে উড়ল বিমান। চলেছে কলকাতা অভিমুখে। এবারও মাঝের সিটে মিতিন, পার্থ, বুমবুম আর টুপুর। সিটবেল্ট খোলার পরেই আচমকা খিদে পেয়ে গেল পার্থর। জুলজুল চোখে দেখছে কখন স্ন্যাক্স-ট্যাক্স আসে। নৈশাহারের এখনও একটু দেরি, বেত যতক্ষণ না আসে কানমলা তো চলুক।

টুপুরের এখনও সিঙ্গাপুরের ঘোর কাটেনি। আপন মনে বলল, “জীবনে প্রথম বিদেশ বেড়াতে এসে জোর একটা অভিজ্ঞতা হল যা হোক।”

পার্থ ঠাট্টার সুরে বলল, “হ্যাঁ। একে বলে শিক্ষামূলক ভ্রমণ।”

মিতিন বসেছে বুমবুমের ওপারে। ঘাড় হেলিয়ে বলল, “কী কী শিক্ষা পেলে শুনি?”

“অনেক। অনেক। কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি! এক নম্বর, সুডোকু একটি বিপজ্জনক খেলা। নয় বাই নয় ঘরের ছক মিলিয়ে যে প্রাইজ মেলে, সেটি গ্রহণ করলে হাতে হাতকড়া পরা অসম্ভব নয়।

দু' নম্বর, বিনি পয়সায় বিদেশ যাওয়ার সুযোগ পেলে নাচতে-নাচতে রাজি হতে নেই। কে যে কীভাবে গাড্ডায় ফেলে দেবে, টেরও পাওয়া যাবে না। তিন নম্বর, অজানা অচেনা কোম্পানির চিঠি থেকে শত হস্ত দূরে থাকা উচিত। চার নম্বর, যারা শুধু ই-মেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করে, তারা লোক মোটেই সুবিধের নয়।"

টুপুর হিহি হেসে উঠল, "তুমি তো বেশ লম্বা তালিকা বানিয়ে ফেলেছ!"

"এ তো গেল শিক্ষার ফর্দ। এর পর যদি কৌতূহলের লিস্টটা পেশ করি, তোর মাসি আঁতকে উঠবে।"

"কেন?"

"দুপুরে অপরাধীকে ধরার পর যা সুচারু যুক্তিজাল বিস্তার করে দিল, তারপর আর কি কোনও প্রশ্নের উত্তর দেবে?"

মিতিন হেসে ফেলল, "আহা, শোনাই যাক।"

"হয়তো খুবই বোকার মতো প্রশ্ন ...তবু," পার্থ টেরিয়ে তাকাল, "নারায়ণ আর শঙ্করন যে একই লোক, তুমি বুঝলে কী করে?"

"শাস্ত্রে পড়োনি, সব দেবতাই তো এক। যিনি শিব, তিনিই বিষ্ণু। যিনি নারায়ণ, তিনিই দেবাদিদেব শঙ্কর।"

"মগজে সেঁধোল না। মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। একটু বাংলা করে বলবে কি?"

"ট্র্যাভেল এজেন্সি থেকে ভাড়া করা গাড়ি কি কেউ নিজে চালায়?"

"দ্যাখো কাণ্ড। এই সরল ব্যাপারটা মাথায় আসেনি!"

"আর কী জিজ্ঞাস্য আছে?"

"অরিজিনাল চিঠিখানা তুমি ঠিক কখন খুঁজে পেয়েছিলে?"

"এই জবাবটা দেওয়া যাবে না।"

"অর্থাৎ সিঙ্গাপুর রওনা হওয়ার আগেই অরিজিনালটা আমার

ব্যাগ থেকে হাতিয়ে তার জায়গায় স্ক্যান করা কপিটা পুরে দিয়েছিলে?"

"মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।"

মা আর বাবার প্রশ্নোত্তরের খেলা মন দিয়ে শুনছিল বুমবুম। হঠাৎই সে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠেছে, "আমি একটা কোয়েশ্চেন করতে পারি?"

"কাকে জিজ্ঞেস করবি? মাকে? না আমাকে?"

"তোমাদের তিনজনকেই।"

"বলে ফ্যালো।'

"সিঙ্গাপুরে একটাও সিঙ্গাপুরি কলা দেখলাম না কেন?"

টুপুর, মিতিন আর পার্থ শব্দ করে হেসে উঠল। সত্যি, এও এক রহস্য বটে। হয়তো এই রহস্যের সন্ধানেই হয়তো তাদের আসতে হবে সিঙ্গাপুর। আরও একবার।

---

9 788177 567090